





















কুশানী

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ঐজলধর সেন

হুল্য বেড়টাকা



সিটার-প্রিন্সিপালচন্দ্র তর্কচাঁদ  
 মানসী প্ৰেস  
 ১৪১ হান্ডল বক্স রোড, কলিকাতা।

## পুনরুক্তি

বহুদিন পূর্বে যখন 'বিশ্বনাথ' লিখি, তখন নিখিয়াহিলাম, যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না, আবার চেষ্টা করিব। তাহার পর 'অভাগী' লিখিবার সময় সেই চেষ্টা করিতে নিয়াহিলাম,—পারি নাই। তখন বলিয়াছিলাম—বারবার তিনবার। এই আমার তৃতীয় বা শেষ প্রয়াস;—জীবন-সাম্রাজ্যে, অসুস্থ শরীরে যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিলাম, ইহাভেই আমার শাস্তি।—

দারিদ্র্যনিঃ  
—*Barjuly*—  
১৯১৯

শ্রীজলধর সেন



বাঁহাৰ মেহ-শীতল ছায়াৰ বসিমা, অমৃত

শৰীৰে ঈশানী লিখিছাছি,

বাঁহাৰ অলুপ্ৰহে ঈশানী জন-সমাজে প্ৰচাৰিত হ'ল,

সেই দম্ভাৰ সাগৰ বৰ্দ্ধমানাধিপতি

শ্ৰীযুক্ত মহাৰাজাধিৰাজ

মাৰ্ বিজয়চন্দ্ৰ মহ্ তাব্ বাহাদুৰ

কে, সি, এস, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম,

মহোদয়ের

কৰকমলে ঈশানী উৎসৰ্গ কৰিয়া

শান্তি লাভ কৰিলাব ।

শ্ৰীজগদধৰ সেন



“উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন  
বাল মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন  
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত !  
তুমি বিজ্ঞোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত !”

—রবীন্দ্রনাথ





আর রক্ষা পাইতেছিল না। দ্বিপ্রহরের সময়ই বড় গিন্নীর অবস্থা খারাপ হইল। বড় কর্তা বলিলেন “রমেশ, আর ডাক্তার ডাকিয়া কোন লাভ নাই। তুমি এক কাজ কর, হরেকৃষ্ণকে একটা টেলিগ্রাম করে দেও ; কিন্তু তাকে আসতে নিষেধ করিও।”

বড় গিন্নী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “ঠাকুরপোকে একবার দেখতে ইচ্ছা করছে বটে, কিন্তু কাজ নেই ; তাকে খবর দিও না। সে খবর পেলেই ছুটে আসবে। এখন এসে কাজ নেই। তাকে দেখতে পেলাম না, তার হাতে অভাগীকে দিয়ে যেতে পারলাম না।”

রমেশ বলিল, “মাঠাকরুণ, ভয় পাবেন না। আপনি সেয়ে উঠবেন।”

বড় গিন্নী বলিলেন “রমেশ, সে আশা আর নেই বাপ ! তোমাকে কিছুই বলে যেতে পারলাম না—সময় পেলাম না। এত শীগগিরই যে যেতে হবে, তা জানতাম না। লক্ষ্মী আমার বড় অভাগিনী। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর বাপ, তাকে তুমি ছাড়বে না—সুখ-দুঃখ তাকে দেখবে। বড় ভাইয়ের মত তাকে পালন করবে। এই কথাটা আমাকে বল—আমি সুখে মরতে পারব। আর শোন লক্ষ্মী, শোন রমেশ, আমি দিবা চক্ষে দেখতে পারছি, একটু সময়ের আগে-পাছের জন্ম আমি সিঁথিতে সিন্দূর নিয়ে মরতে পারলাম। কর্তাও আর নেই ; তিনিও আমার সঙ্গে-সঙ্গেই আসছেন। ঐ দেখ, আমি দেখতে পাচ্ছি।” এই বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে বড় কর্তা একবার বাহিরে গেলেন ; একটু পরেই ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন “গিন্নী, তোমার কথা কি মিথ্যা হয়। মা লক্ষ্মী, আমি যে আঁধার দেখছি, আমাকে শুইয়ে দে মা !”

একবার ভেদ হইয়াই বড় কর্তা শয্যাশায়ী হইলেন। পাশাপাশি ছুই শয্যা রচিত হইল। লক্ষ্মীর তখন আর কান্না নেই—সে উৎস তাহার শুকাইয়া গিয়াছে। সে একবার মায়ের মুখে, একবার বাপের মুখে গজাজল দিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল “বাবা, বিশ্বনাথের নাম কর” “মা, অন্নপূর্ণাকে ডাক।”

রমেশ অকুল সাগরে পড়িল ; সে যে কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। লক্ষ্মীকে বলিল, “দ্বিদি লক্ষ্মী, তুমি একটু একেলা থাকতে পারবে। আমি এক দৌড়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাই।”

বড় কর্তা বলিলেন, “রমেশ, আর ডাক্তার ডেকে কি হবে ; এখন মুখে গজাজল দেও, আর বাবার নাম শুনাও।”

রমেশ বলিল, “সে ত আছেই ঠাকুর মশাই ! এমন করে বিনা চিকিৎসায় ত রাখতে পারি নে। দ্বিদি লক্ষ্মী, কোন ভয় নেই। আমি যাব, আর আসব।”

বড় গিন্নী বলিলেন “রমেশ, আমার লক্ষ্মীর যে আর কেউ নেই বাবা !”

রমেশ তখন উর্দ্ধ্বাসে ডাক্তারের বাড়ী গেল ; বলিল, “ডাক্তার বাবু, আপনি যা চাইবেন, তাই দেব, একবার আসুন ; গিন্নীমাঝে

ভখন দেখে এসেছেন, কর্তারও ঐ রোগে ধরেছে। আপনি একটীবার আনুন।”

ডাক্তার বলিলেন, “গিয়ে কি হবে বাপু, এতদিনের মধ্যে একটীকেও ত বাঁচাতে পারলাম না; সব ওষুদ বুঝা হয়ে যাচ্ছে। আর গিয়ে কাজ নেই; এই ব্যবস্থা লিখে দিচ্ছি; ওষুদ নিয়ে যাও, খাওয়াও; আয়ু থাকে, বাঁচবে। গিয়ে কোন ফলু নেই।”

রমেশ অনেক মিনতি করিল; ডাক্তার আসিলেন না। রমেশ ভখন ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া, মনে করিল, এঁদের বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া দরকার। যে রকম অবস্থা, তাতে কর্তা গিন্নী কাহারও রক্ষা নেই। মেয়েটীকে লইয়া সে মহাবিপদে পড়িবে। এই মনে করিয়া রমেশ ডাকঘরে বাইয়া হরেকৃষ্ণকে টেলিগ্রাম করিল; তাঁহার ঠিকানা সে পূর্বেই জানিত।

প্রায় আধঘণ্টা পরে রমেশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ছইজনেরই অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। রমেশ বলিল, “ঠাকুর মশাই, ওষুদ এনেছি; একটু খান।”

“আনার আর ওষুদে কিছু হবে না। দেখ, গিন্নীকে বাঁচাতে পার কি না। আর হরেকৃষ্ণকে একটা খবর দেও।”

রমেশ বলিল, “তাঁকে তার করেছি।”

“বেশ করেছ বাবা! এখন গিন্নীর জন্ত ভাল করে চেষ্টা কর; তাঁকে না বাঁচাতে পারলে লক্ষ্মীর কি হবে?”

লক্ষ্মী বলিল, “বাবা, এখন বিশ্বনাথের নাম করুন। আমার অনুষ্টে বা থাকে, তাই হবে।”

“মা, তোকে কার হাতে দিয়ে যাব। তুই যে বড় অভাগিনী।”  
বড় কর্তার চক্ষু দিয়া জল-পড়িতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল, “বাবা, কাতুর হবেন না। ঠাকুর দেবতার নাম  
করুন।”

বড় কর্তা ‘হুঁ’ বলিয়া নীরব হইলেন; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি  
পার্শ্বের বিছানার দিকে;—সে যে কি দৃষ্টি, তাহার বর্ণনা করা যায়  
না। বড় কর্তা এক দৃষ্টিতে তাঁহার জীবন-সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া  
রহিলেন, আর একটা কথাও বলিলেন না।

বড় গিন্নী স্নধু বলেন, “লক্ষ্মী, মা আমার, তোকে যে ভাসিরে  
দিয়ে গেলাম। ও রমেশ, বাবা, দেখ কর্তা কেমন করছেন। ঠাকুর  
সুখে একটু গঙ্গাজল দে মা! হে ঠাকুর, আর কোন প্রার্থনা নেই,  
আমাকে আগে নিয়ে যাও—আমাকে আগে। আর ঐ হতভাগিনী  
—মা গো!”

লক্ষ্মীর চক্ষে জল নাই; একবার সে পিতার পার্শ্বে বাইরা বসে,  
আবার বখন মাতা কেমন করিয়া উঠেন, তখন মাথের কাছে যায়।

বেলাও বাইতে লাগিল; ছুই জনের অবস্থাই ক্রমে ঋণাপ  
হইতে লাগিল। রমেশ দেখিল, রাজিও কাটিবে না,—হয় ত  
সঙ্কার মধ্যেই সব শেষ হইয়া বাইবে। সে তখন ছুই জনেরই  
জীবনের আশা ত্যাগ করিল; তাহার ভাবনা, এঁদের সঙ্গতির কি  
হইবে। রাজিতে সে একেলা কি করিবে? এখন হইতেই সে  
ব্যবস্থা না করিলে ত হয় না।

রমেশ বাড়ীর বাহিরে বাইরা দেখে; তাহার পরিচিত এক বৃদ্ধ

গীজাখোর রাস্তা দিরা বাইতেছে। রমেশ তাহাকে ডাকিল;—এ সময় বে হয় একজন লোক বাড়ীতে পাইলেও তাহার ভয়সা হয়।

রমেশ বলিল, “সিধু দাদা, বড় বিপদে পড়েছি ভাই! এ বাড়ার কর্তা-গিন্নী ছইজাই বান-বান হয়েছেন। একটা মাত্র মেয়ে, আর আমি। তুমি যদি ভাই, একটু উপকার কর, তা হলে চিরদিন মনে থাকবে।”

“আমি কি করব—আমি যে কায়স্থ; আমি ত আর কাঁধ নিতে পারব না—আর সে ক্ষেমতাও নেই।”

রমেশ বলিল, “সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না। তার ব্যবস্থা যা হয় আমি করব। তোমাকে সুখু এই বারান্দার ব’সে থাকতে হবে।”

সিধু বলিল, “তা ত পারি ভাই, তবে কথা কি জান? সারা-দিন পেটে কিছু পড়ে নি, তারপর তামাকটুকু যে খাব, তারও পয়সা নেই। তিন্কে আর মেলে না; প্রায় সকল ধরেই কান্না পড়ে গিয়েছে, তিন্কে কে দেয় বল?”

রমেশ বলিল, “সে জন্ত তুমি ভেব না। আজ আর তিন্কে নাই করলে। আমি তোমায় এই চার আনা পয়সা দিচ্ছি এর থেকে পয়সা চেয়েকের ভূজা কিনে আন, আর বাকী তিন আনার তোমার তামাক নিয়ে এস। তারপর এখানে এই বারান্দার ব’সে থাক। তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না—সুখু ব’সে থাকবে। আমি একলা মাহুয; মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলে ত কোন কিছুই করতে পারব না।”

সিধু বলিল, “বেশ, তা পরশা দেও।”

রমেশ তাকে চারি আনা পরশা দিয়া বলিল, “বাও ভাই  
সিধু, শীগগির ফিরে এস। পালিও না বেন।”

সিধু বলিল, “আরে তুমি কও কি! রাধামাধব! নেশা করি  
বলে কি আর ধর্মজ্ঞান নেই। আমি এখনই আসছি।” এই  
বলিয়া সিধু চলিয়া গেল; এবং একটু পরেই আসিয়া বলিল, “এই  
দেখ ভাই, আমি এসেছি। দেখ, একটু আগুনের ব্যবস্থা করে  
দেও, আর কিছুই দরকার নেই।”

সিধুকে পাইয়া রমেশের ভরসা হইল। সিধু বারান্দার বসিয়া  
রহিল। রমেশ একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিল।  
এমন বিপদে সে কখনও পড়ে নাই।

সন্ধ্যার সময় বড় কর্তা বেশী কাতর হইয়া পড়িলেন। রমেশ  
একটু-আদটুকু নাড়ী দেখিতে জানিত। সে দেখিল, বড় কর্তার  
নাড়ী ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে; গিন্নীর নাড়ী বেন একটু সবল। সে  
তখন চুপে-চুপে, লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিল, “দিদি লক্ষ্মী, কর্তার  
অবস্থাই বেশী খারাপ।”

কথাটা বড় গিন্নীর কাছে গেল, অথবা তিনি ভাইবেই কথাটা  
বুঝিয়া লইলেন; বলিলেন, “রমেশ, তা ত হবে না—হতে পারে  
না, বাবা! আমাকেই যে আগে যেতে হবে।”

রমেশ বলিল, “ও কি বলছেন মা! আপনার নাড়ী বেশ ভাল।  
আপনার কোন ভয় নেই।”

বড় গিন্নীর কথা জড়াইয়া আসিতেছিল; তিনি বলিলেন, “ভয়

আর নেই বাবা। একটা কাজ কর, গুঁর পায়ের ধূলা এনে আমার মাথায় দেও। আমার যে উঠবার শক্তি নেই।”

লক্ষ্মী তাহাই করিল। বড় গিন্নী একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আঃ! শরীর জুড়িয়ে গেল;—রোগ ত আর নেই মা!” রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “বাবা রমেশ, আবার বলছি, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর বাবা, লক্ষ্মীকে তুমি দেখবে। ওর কথা ত তোমাকে কিছুই বলতে পারলাম না। বড় পোড়া কপাল ওর বাবা! তুমি ওকে ঘৃণা কোরো না। মেয়ে আমার সতীলক্ষ্মী। ওকে আশ্রয় দিও বাপ! লক্ষ্মী, একটু সরে বোস মা। গুঁকে একবার ভাল করে দেখতে দাও—একবার শেষ দেখা দেখে নেই। রমেশ, লক্ষ্মীকে তোমায় হাতে—”

আর কথা বাহির হইল না; দুইটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া সতী-শিরোমণি স্বামীর দিকে চাহিয়া চিরদিনের জন্ত নীরব হইলেন।

লক্ষ্মী একক্ষণও ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল; এখন আর চূপ করিয়া থাকিতে পারিল না;—“মা, মাগো” বলিয়া মায়ের বুকের উপর আছাড়িয়া পড়িল।

তাহার চাঁৎকারে বড় কর্তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি গৃহিণীর দিকে চাহিয়াই ছিলেন; কিন্তু কিছুই লক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন অতি ক্রীণ, অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “গিন্নী, আগেই গেলো। বাও—আমিও আসছি—এখনই আসছি। তাই হয়েকক! ভাই রে!”



সব শেষ হইয়া গেল। দুই মিনিট আগে-পাছে দুইটা আত্মা  
চলিয়া গেল।

রমেশ দাঁড়াইয়া এই দৃষ্ট দেখিল; এমন মরণ ত সে কখন  
দেখে নাই। এ যে মহামরণ,—এ যে যুক্তি করিয়া গুহান।

রমেশ কাঁদিয়া উঠিল, “দেবতা, এই দেখবার অস্ত্র কি কাশী  
এসেছিলে;—এরই অস্ত্র কি রমেশকে ডেকে এনেছিলে—এত  
আমর করেছিলে।”

রমেশ মাটিতে বসিয়া বাগকের মত কাঁদিতে লাগিল; লক্ষ্মীও  
মায়ের বুকের উপর পড়িয়া রহিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; ঘর অন্ধকার! এই অন্ধকারে  
দুইটা মৃতদেহ হইয়া ঘরের মধ্যে দুইটা শ্রাণী!

সিধু বাহিরেই বসিয়া ছিল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ  
না পাইয়া, এবং ঘরের মধ্যে আলো না দেখিয়া সে ডাকিল, “ও  
রমেশ ভাই, অন্ধকার ঘরে বসে কি করছ। ওঠো, আলো জ্বাল।  
এব শেষ হয়ে গেছে না কি। ও রমেশ!”

সিধুর ডাকে রমেশের চমক ভাঙ্গিল। সে ডাকিল, “দিকি লক্ষ্মী!”  
লক্ষ্মীর তখন উত্তর দিবার শক্তি ছিল না; রমেশের ডাক  
ভাহার কর্ণে গেল; কিন্তু সে কথা বলিতে পারিল না।

রমেশ আর কিছু না বলিয়া সেই অন্ধকারেই হাতড়াইয়া  
হারিকেন লঠন পাইল; কিন্তু মিয়াসলাই কোণায়, তাহা খুজিয়া  
পাইল না। লক্ষ্মীকে একত্র বিরক্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল  
না। সে লঠনটা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল।

সিধু জিজ্ঞাসা করিল, “কি ভাই, ওদিকে সব শেষ বুকি।”

রমেশ বলিল, “সব শেষ সিধু দা!। তোমার কাছে দিয়ারদাই আছে? আলোটা যে জ্বালতে হবে।”

সিধু বলিল “আছে বই কি।”

রমেশ আলো জালিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গেল; সেখিল লক্ষ্মী সেই একই ভাবে মায়ের বুকের উপর পড়িয়া আছে।

রমেশ বলিল, “দিদি লক্ষ্মী, ওঠ, আর কেঁদে কি করবে। যা করতে কাশীতে এসেছিলে, তা হয়ে গেল। হতভাগ্য রমেশকে যা দেখাতে এনেছিলে, তা দেখলাম। এখন আর কাঁদবার সময় নেই। সে সময় পরে চের পাওয়া যাবে। দেবতাদের সংকারের আয়োজন ত করতে হবে। বাসি মড়া রমেশ হেঁচ থাকতে হতে দেবে না। এই রাত্রেই যেমন করে হোক সংকার করতে হবে।”

লক্ষ্মী এবার উঠিয়া বসিল। এখন ত কাঁদবার সময় নয়। পিতামাতার শেষ কাজ ত তাহাকেই করিতে হইবে। তার পর;—তার পর—সব অক্ষকার!

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশদা, এই রাত্রে কি উপা হবে?”

রমেশ বলিল, “সে জল্প ভাবনা নেই, ি লক্ষ্মী! সংকারের কথা বলছ ত? সে আমি এখনই ঠিক করে ফেলছি। এই রাত্রেই সে ব্যবস্থা করতে পারব। কিন্তু একটা বড় ভািনার পড়েছি। এমন যে হবে, তা ত ভাবিনি। তা হলে দিনের বেলাতেই কুঠীতে গিয়ে টাকা আনতে পারতাম। এখন ত

লাগে। বাবে না। হাতে যা ছিল, সে সব খরচ হয়ে গেছে ; সামান্য কয়গুণা পয়সা আছে। থাক, তারও ব্যবস্থা করছি। তুমি একেলা একটু থাকতে পারবে। বাইরে সিধু রইল, কোন ভয় নেই। আমি যেমন করে হোক, টাকা আর বামুন নিয়ে আসছি। আমার দেৱী হবে না।”

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশদা, টাকার ভাজ ভেব না। মাঝের বাক্সে অনেক টাকা আছে। কত লাগবে বল, বের করে আনি। সব টাকাই এনে তোমার কাছে দিই, তুমি যা হয় কর। আমি একেলা থাকতে পারব। ভয় কিসের—ওঁরা যে আমার মা আর বাবা!” বাবা গো বলিয়া লক্ষ্মী আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

রমেশ বলিল, “কৈদ না দিদি লক্ষ্মী! সব টাকা কি হবে? গোটা পঞ্চাশেক বার করে দেও। এই মড়িপোড়া বামুনগুলোর এখন মরমুম পড়েছে কি না; তাতে রাজিকাল। পাঁচ-পাঁচ টাকার কমে কেউ যেতে রাজি হবে না। যেমন করে হোক আট দশজন বামুন ত লাগবে। সে আমি যোগাড় করে জানতে পারব।”

লক্ষ্মী তখন বাস্তু খুলিয়া কতকগুলি টাকা আনিয়া দিল, তখন আর তাহার টাকা গণিবার ইচ্ছা হইল না।

রমেশ বলিল, “টাকাগুলো গণে দেখি, কি জানি শেষে ক'না পড়ে।” সে গণিয়া দেখিল ৭১ টাকা। “এতে চের হবে। বাক্সে আর কিছু রইল কি?”

লক্ষ্মী বলিল, “আরও আছে।”

রমেশ বলিল, “রাতটা বেটে গেলেই হয়; তার পর আমি টাকা আন্তে পারব।”

ছাবের কাছে বাইরা সিধুকে বলিল, “সিধু ভাই, তুমি এই ছরারটির কাছে এসে বোস; দিনি লক্ষ্মী একেলা থাকতে ভয় না পার।”

সিধু বলিল, “ভয় কিসের? আমি এই দোর-গোড়ান বসে রইলাম। বাও রমেশ, বেশী দেয়ী কোরো না। তোমার ভ আর এ কাশীর কিছুই অজানা নেই। ঐ রামাদের আড্ডার যেও; সেখানে ঢের লোক পাবে।”

রমেশ বলিল, “সেইখানেই যাচ্ছি। তুমি সিধু দা! এদিকে একটু নজর রেখো।”

সিধু বলিল, “সে আর আমাকে বলতে হবে না, তুমি যাও।”

রমেশ তখন দশটা টাকা টেকে গুজিরা বাকী টাকা কোঁচার খুঁটে বাধিয়া লইল; বলিল, “দিনি লক্ষ্মী, আমি সব ঠিক করে লোকজন নিয়ে এখনই আসব। এখনকার সব আমার চেন, একটুও দেয়ী হবে না। দেখো ভাই সিধু।” বলিয়া রমেশ বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মী দুইটা মৃতদেহ দুপাশে লইয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

রমেশ বাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই করিল। আধ খণ্ডের মধ্যেই বড় একখানা খাট ও দশজন বামুন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল।

এরা রামার দল। দলের সর্দার রামাও আসিয়াছিল;—

রমেশের কাছে তাহার কত সময় কত উপকার পাইয়াছে ;  
 আর এই অদমনে, তাহার সাহায্য করিবে না। তবে  
 পরশা,—সে কি আর ছাড়া বাকু ;—এ যে তাহাদের ব্যবসায় ।

রামা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল। কিছু-  
 ক্ষণ দুইটা মৃতদেহ দেখিয়া বলিল, “রমেশদা! এ যে হরগোরী  
 দাদা! এতদিন এই কাশীতে কত মড়া পুড়িয়েছি, এমন ত দেখি  
 নেই।” এই বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিল, “দেখ্, ব্যাটারা, এতদিন  
 অনেক মড়া পুড়িয়েছিষ্ ; আজ ঘাদের পোড়াবি, তেমন কোনদিন  
 দেখিষ্ নি—একেবারে হরগোরী। কি বলব, রাত্রি, নইলে  
 সমস্ত কাশীধাম ঘুরিয়ে নিয়ে যেতাম—লোকে দেখ্ত কেমন  
 মরণ।”

রমেশ সেই সময় বাহিরে আসিয়া বলিল, “রাম, তোদের  
 সঙ্গে ত কোন কথা হয় নাই ; ডেকেছি আর এসেছিষ্।  
 এখন বল, তোরা দশজনে কত নিবি। কিন্তু বলে দিচ্ছি  
 ভাই, ঘাটে নিয়ে ফেলেই পলাতে পারবি নে। দেখ্‌ছিষ্  
 ত ঈরা ব্রাহ্মণ। আমি ত আর ছুঁতে-করতে পারব না।  
 থাক্‌বার মধ্যে আছে ঐ একটা মাত্র মেয়ে। ও আর কি  
 করবে? তোদেরই সব করতে হবে, বুঝলি।”

রামা বলিল, “সব বুঝেছি দাদা! কিন্তু কি করব, এই  
 আমাদের পেশা ; নইলে কি টাকা চাই। তা দেখ, এই রাজে,  
 আর আজকালকার এই দিনে জন-প্রতি পাঁচ টাকার কমে

কেউ কাঁধ দিত না। তবে, একে তুমি আমাদের কত উপকার করেছ, তার পর এমন হরগোরী। যাক্, তুমি আমাদের তিনটা করে টাকা দিও। দেখ্ বেটারা, ফেউ এতে আপত্তি করিস্ নে। টাকা ঢের পেয়েছি, বেঁচে যদি থাকি, আরও কত পাব; কিন্তু এমন মড়া হরত আর কাঁধে করতে পারব না। আজ তোদের জন্ম সফল হয়ে যাবে। এই কথা রুইল, রমেশনা, কি বল ?”

রমেশ বলিল, “বেশ, তাই দেব। আর দেবী করিস্ নে; রাত প্রায় নটা বাজে।”

তখন সকলে ঘরের মধ্যে গেল। রামা বাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক; এমন সুতদেহ—এমন হরগোরী এক সঙ্গে, একখাটে শরন করাইয়া তাহারা কোন দিন শ্মশানে লইয়া যায় নাই।

রামা বলিল “কেমন, যা বলেছি, ঠিক না। দেখ্, তোদেরও মা-বাপ ছিল, কারও বা এখনও আছে। আজ ঠাট্টা ভামালা করতে কেউ পাবিনে। আজ মনে কর, তোদেরই বাপ-মা মরেছে; তোরা তাদেরই শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিস্। তা যদি না পারিস্, ঘাটে গিয়ে যদি মদ-গাঁজা চালাতে চান্, তাহলে সরে পড়্। আমি দোসরা লোক নিয়ে আস্ছি।”

সকলেই সম্মুখে বলিল, “না, আমরা আমাদের বাপ-মাকেই নিয়ে যাচ্ছি, কোন বেয়াদবি করব না।”

রামা তখন রমেশকে বলিল “রমেশনা, আমরাও ব্রাহ্মণের ছেলে। লেখাপড়া শিখি নাই; বদ্ সঙ্গে পড়ে, আর এই

কাশীর কুপার বদ্মায়েস হয়েছি ; শুণামি করি, মদ গাঁজা খাই, আরও কত কি করি ;—কিন্তু তবুও আমরা ব্রাহ্মণের ছেলে। আজ তুমি আমাদের বা বইতে এনেছ, এমন দেখিনি। শোন, এত রাজে ত আর সহর ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই ; কিন্তু একটা কাজ করতে হবে দাদা ! এই তোমাদের ধূপ, দি, আর চন্নন-কাঠ দিয়ে দাহ করতে হবে। আমাদের টাকা আজ দিতে না পার, নাই পারলে, আর একদিন দিও ; সেই টাকা দিয়ে আজ এই সব করতে হবে।”

দলের মধ্যে দুই তিনজন বলিয়া উঠিল, “চাইনে আমরা টাকা—আমরা টাকা নেব না। আজ এঁদের চন্নন-কাঠ দিয়ে দি দিয়ে দাহ করব। আমাদের আর কিছু দিতে হবে না, টাকা আমরা অনেক রোজগার করতে পারব।”

সকলেই বলিয়া উঠিল “নেব না টাকা !”

লক্ষী আর স্থির থাকিতে পারিল না ; সে কাঁদিয়া উঠিল,— “বাবাগো, মাগো,” একবার চেয়ে দেখ গো ! তোমাদের কত ছেলে আজ তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ! একবার দেখ বাবা ! একবার মুখ তুলে চাও মা !”

রমেশ গগন কণ্ঠে বলিল, “বাবা বিখনাথ, কোন দিন তোমার ডাকিনি, কোন দিন তোমার নাম করিনি। আজ তুমি একি খেলা খেলালে বাবা ! বারা কাশীর শুণা, বাদের দেখে সহরের লোক ভয় পায়, আজ তাদের দ্বিগুণ একি খেলা খেলছ বাবা ! বল, জর বাবা বিখনাথ কি জর !”

সেই নৈশ গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া, সেট নিস্তর পন্নী  
মুখর করিয়া, সেই গৃহ হইতে বজ্রগভীর শব্দ উঠিল—

“জয় বাবা বিশ্বনাথজি কি জয়!”

লক্ষ্মীও সকল শোক ভুলিয়া, তাহাদের কর্ণে কর্ণ মিশাইয়া  
উঠিলেঃ যবে বলিল “জয় বিশ্বনাথজি কি জয়।”

বাহির হইতে গাঁগাখের সিধুও বলিয়া উঠিল “জয়, বাবা  
বিশ্বনাথজি কি জয়, জয় মা অন্নপূর্ণাকি জয়!”

ধরাতলে স্বর্গ নামিয়া আসিল। এই সমবেত কাতর কর্ণের  
জয়ধ্বনি নিশ্চয়ই—আমি বলিতেছি নিশ্চয়ই—বাবা বিশ্বনাথের  
কর্ণে পৌঁছিল। তোমরাও সকলে বল—সকল কর্ণ এক  
করিয়া বল—সর্ব-জাতি-নির্কিঁশেষে বল—‘জয় বাবা বিশ্বনাথজি  
জয়!’ এই শ্রবণ-যাত্রার পথে দাঁড়াইয়া একবার সেই  
বিশ্ববিজয়ী নাম কর,—সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে—জীবন ধন  
হইবে।

তাহার পর সকলে মিলিয়া, বাবা বিশ্বনাথের নাম করিতে-  
করিতে সেই দেব-দম্পতিকে মণিকর্ণিকায় লইয়া গেল। যথেষ্ট  
শুপ, ঘৃত, চন্দনকাঠ আনীত হইল। দুইটা দেব একই চিতায়  
ভুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে লক্ষ্মীকে অগ্রবর্তিনী করিয়া  
সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিল; তাহার পর সেই দেব-দেবী  
অগ্নি-সংযোগ করিল।

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিদেব সেই দেব-দেবীকে প্রদক্ষিণ



করিয়া শিখা বিস্তার করিলেন। অত রাত্রিতেও অনেক লোক  
সংবাদ পাইয়া, এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতে আসিল,—ধন্য ধন্য করিতে  
লাগিল।

দুই ঘণ্টা পরে সমস্ত কার্য শেষ করিয়া, সকলে ঘরে চলিয়া  
গেল। রমেশ লক্ষ্মীকে লইয়া শুল্ক-গৃহে ফিরিয়া আসিল।

সিধু বাড়ীতে প্রহরী ছিল। তাহার। এত শীঘ্রই ফিরিয়া  
আসিল দেখিয়া বলিল, “রমেশ দা, এত শীগ্গিরই সব শেষ  
হয়ে গেল।”

রমেশ উত্তর দিবার পূর্বেই লক্ষ্মী “বাবা গো!—মা গো”  
বলিয়া প্রাঙ্গণে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। রমেশ লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, অনেক সাস্বনা দিয়া, তাহার স্ত্রীজা কাপড় ছাড়াইল। লক্ষ্মী ঘরের এদিক-ওদিক চায়, আর কাঁদিয়া উঠে।

রমেশ বলিল, “দিদি লক্ষ্মী, এখন একটু ঘুমোও। সারাদিন টুকুও দেও নাই; তার পর এই শরীর; শেষে তোমাকে নিয়ে বিপদে পড়তে না হয়।”

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশ দা, এখন তাই যে আমি চাই। বাবা গেলেন, মা গেলেন; আমি বেঁচে থাকলাম কেন? আমারই যে আগে বাওয়া দরকার ছিল রমেশ দা।”

রমেশ বলিল, “যে নিয়ে বাবার মালিক, সে ত দিদি কারও দরকারের দিকে চায় না—তার মত সে নিয়ে যায়।”

লক্ষ্মী বলিল, “তুমি জান না রমেশ দা, আমার মরবার দরকার এত বেশী কেন?”

“সে আমার জেনে কাজ নেই দিদি! তুমি ঘুমোও।”

লক্ষ্মী বলিল, “না দাদা, আজ আর আমার ঘুম হবে না। তুমি আমার কথা কিছুই জান না; তাই আমাকে ঘুমুতে বলছ। আমার কি ঘুম আছে তাই! তোমরা যখন মনে করেছ,

আমি ঘুমিয়েছি, আমি তখনও জেগে। এমনই করে আমার দিনরাত কেটে গেছে।”

রমেশ বলিল, “সে কথা এখন থাক্, তুমি শোও লক্ষ্মী দিদি আমার।”

লক্ষ্মী বলিল, “না রমেশ দা, আজ ত আমি শোব না। আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা শুন্তে হবে। শোন নি, মা মরবার আগে কতবার বলেছেন, আমি বড় হতভাগিনী। তাই অত করে তোমার হাতে আমাকে দ্বিগ্নে গিয়েছেন। তুমি না শুন্লে আর কে আমার দুঃখের কথা শুন্বে?”

“আজ নয় দিদি, আর একদিন শুন্বো। আজ যে আমার কিছুই ভাল লাগছে না।”

“না দাদা, সে হবে না। এখনও গন্ধার ঘাটে গিয়ে দেখে এস, আমার মা-বাপের চিত্তা গরম রয়েছে। এখনই তোমাকে শুন্তে হবে। কে বলতে পারে, আর যদি সময় না হয়।”

রমেশ বলিল, “তুমি কি পাগল তলে দিদি লক্ষ্মী! তোমার শরীরে যে ভাল নয়; একটু চুপ করে শোও।”

লক্ষ্মী বলিল, “তোমার পায়ে পড়ি রমেশ দা, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার কথা রাখ। আজই তোমাকে সব বলি। তা হলে আমার বুক একটু হাল্কা হবে দাদা!”

রমেশ বলিল, “নিশ্চয়ই যদি তোমার জেদ হয়ে থাকে, বল, কিন্তু এখনও বলছি, এই অবস্থায় সারারাত জাগলে নিশ্চয়ই

তুমি এমন সাহস করতে পারতে না; দশজনে যা করে, তুমিও তাই করতে। কিন্তু তুমি দশজনের অনেক উপরে। তুমি সতাই লক্ষ্মী! তোমার সমাজ—তোমার আপনার জন তোমাকে যা মনে করতে হয় করুক, আমি তোমাকে কোলে তুলে নিচ্ছি। তোমার শাস্তরে কি বলে, তা আমি জানিনে, আর জানতেও চাইনে; এই কাশীতে অনেক শাস্তর দেখলাম। তোমার শাস্তরের উপর, তোমার সমাজের উপর আমার কোন দিনই ভক্তি ছিল না—আজও হবে না। তুমি ঠিক বলেছ, তুমি সতী; তোমার কোন অপরাধ নেই—কোন অপরাধ নেই দিদি! যে তোমার সর্বনাশ করেছে, সে কে, তা তুমি জান না—আর জেনেও কাজ নেই;—সে ত সেই রাত্রেই মরে গেছে।—তুমি ঠিক বলেছ—সে সেই রাত্রেই মারা গেছে। সেই দিন থেকেই তুমি বিধবা। কে তোমায় কি বলতে পারে? আশুক ত দে! কেমন তার শাস্তর; কেমন তার সমাজ, আমি বুঝে নেব। শোন দিদি লক্ষ্মী, তুমি বিধবা; বিধবার মতই থাকবে। আমি তোমাকে প্রতিপালন করব। তোমার যে সন্তান হবে—তাকে আমি মানুষ করব—সত্যি মানুষ করব। তার পর সে যাতে তোমাদের এই সমাজের ভয় না করে, তার মত তাকে শেখাব। তুমি কিছু ভেব না। আজ বুঝলাম, এই ভার বইবার জন্তই আমি ঐ দিন বেঁচে ছিলাম। দশ বছরের সময় মা আমাকে একেলা ফেলে যখন চলে গেল, তখন যে মরি নাই—সে এই কাজের জন্ত; তার পর যে-ঘর-সংসার করি নাই—সে ইচ্ছা যে হয় নাই

—সে এই কাজ করবার জন্য। তার পর, এই যে চির-কালটা স্বীলোককে মর বোন ভিন্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখি নাই, কোন দিন যে কোন বদ্ চিন্তাও আমার মনে হয় নাই; সে আমার বাহ্যিক নয়,—তা আত্ম বুঝলাম। যে আমাকে এই কাজের ভার দিয়ে যাবে, সেই তোমার মা-ই আমাকে এ কাজের মত, এ ভার বহুবার মত শক্তি দিয়েছেন; তাই আমি আজ কোন ভয় না করে, দিদি লক্ষ্মী, তোমার ভার নিলাম। তোমার মা তাই কেনেই আমার হাতে তোমাকে দিয়েছেন। বেশ, তাই হবে। আজ থেকে রমেশ জানি নূতন সংসার পাতবে। সে সংসারে থাকবে তার লক্ষ্মী দিদি, আর থাকবে রমেশ—আর থাকবে যে আসছে।”

লক্ষ্মী এইক্ষণ হির ভাবে রমেশের কথা শুনিতেছিল। এত মরা, এত মমতা এই রমেশের! এত উচ্চ হৃদয় এই রমেশ দাদার! সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, “রমেশ দা, তুমি মানুষ, না দেবতা। এমন কথা তো আমার কাঁকার মুখেও শুনি নাই। আমার কাঁকাও তোমারই মত। তবে তিনিও যে সংসারী; তাঁকেও যে সব দিক চাইতে হয়, সমাজের মুখ চাইতে হয়। তা নইলে, তিনিও তোমারই মত।”

“কিন্তু তাঁর ত উপায় ছিল না।”

রমেশ বলিল, “তাঁর কথা যা তোমার কাছে শুন্লাম, তাতে তিনিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না—তাঁর যে সংসার আছে, সমাজ আছে। তাঁকে আর বিপদে ফেলে কাজ কি ?

দেখ তাঁকে তার করেছি ; তিনি খুব সম্ভব পরশু এসে পড়বেন । তার পূর্বেই তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে, মুকিয়ে যেতে হবে । তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? কালই তোমাকে আমি অস্ত্র যারগায় নিয়ে যাব ; কেউ সে সংবাদও জানতে পারবে না । তারপর তোমার ভার আমার উপর । আমি যেমন করে হোক, তোমাকে প্রতিপালন করব ।”

লক্ষ্মী বলিল, “সেই ভাল । তুমি তাই ঠিক কর । কিন্তু রমেশদা, কা’লই যে আমি যেতে পারছি নে । কাকা-কাকী দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবেন । তাঁদের একবার না দেখে, জন্মের শোধ তাঁদের কাছে বিদায় না নিয়ে যে আমি যেতে পারব না । রমেশদা, কাকা যে আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন । তুমি বলবে, তা হলে কি করে যাব । সে আমি পারব । কাকা যা করতে চাইবেন, তা আমি তোমাকে এখনই বলে দিতে পারি । তিনি বলবেন, তিনি বাড়ী গিয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আমাকে নিয়ে জীবন কাটাবেন ; আমার জন্ত তিনি সব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হবেন । আমার কাকীমাও তাই বলবেন । সেই কথাগুলো একবার তাঁদের মুখে শুভে চাই—তোমাকেও শোনাতে চাই । তুমি দেখতে পাবে, তোমারই মত আর একজন আমার আছে ।”

“তারপর কি করে যাবে ?”

“যাব, নিশ্চয়ই যাব । মিনি আমার জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবেন, পথের ভিখারী হতে চাইবেন, আমি কি তাঁকে তা-

করতে দিতে পারি? কিছুতেই না রমেশ দাদা, কিছুতেই না। শুবুও একবার তাঁদের না দেখে, তাঁদের মুখের কথা না শুনে যেতে পারব না। তাঁরা আসুন; এদিকে তুমিও একটা গোপন স্থান ঠিক কর। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে একদিন রাত্রিতে আমি গালিয়ে যাব। একখানা পত্রে সব কথা খুলে লিখে দিয়ে আমি জন্মের মত বিদায় হব। তারপর এই কাশীতে কি ছুটো অন্ন মিলবে না? তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়ো, রক্ষা কোরো; আমি কারও বাড়ীতে দাসীগরি করে, রাঁধুনীর কাজ করে জীবন কাটাব।”

“সে সব কিছুই তোমাকে করতে হবে না বিদিশী, তাঁর ব্যবস্থা আমার উপর;—সে ভার মাঠাকরুণ আমাকে দিয়ে গেছেন, তোমাকে দেন নাই। এখন ত কথা শেষ হোলো; তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুমোও ত দিদি। মনে কোন আশঙ্কপ রেখো না; তোমার কোন অপরাধ নেই—তুমি আমার সতীলক্ষ্মী দিদি। কা’লই আমি সব ঠিক করে ফেলব। এই কাশী ছেড়ে যেতে পারব না। এখানেই তোমাকে আমি এমন করে লুকিয়ে রাখব যে, কেউ তোমার খোজ পাবে না।”



পরদিন লক্ষ্মী রমেশকে বলিল, “রমেশদা, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ ত  
 দরকার। আমি সেটা করে ফেলি। তুমি সামান্য রকম উত্তোঙ্গ  
 করে দেও। পণ্ডিতেরা হয় ত বলবে, আমার অধিকার নেই,  
 আমি পতিতা। কিন্তু তুমিও তা স্বীকার করবে না, আমিও  
 স্বীকার করি না। আমি মা-বাবার শ্রাদ্ধ করব। কোন রকমে  
 কাজ শেষ করব। যা টাকা আছে, তা এই কাজেই ব্যয় করে,  
 একেবারে খালি হাতে পথে গিয়ে দাঁড়াব।”

রমেশ লক্ষ্মীর কথা মত আয়োজন করিল। অল্প কিছুই করা  
 হইবে না, শুধু দে-দিনের খশান-সঙ্গী করজনকে খাওয়ানো স্থির  
 হইল। একজন পুরোহিতেরও ব্যবস্থা করা হইল।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে রামার দল আনিয়া নিশ্চিত হইল।  
 তাহার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিল; সেই বাজারে গেল,  
 কেহ রামায় ব্যবস্থা করিতে লাগিল। রামা বলিল, “মিদি ঠাকরুণ,  
 তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না; আমরা সব করে নেব।”

লক্ষ্মী বলিল, “তোমরা সেদিন আমার ডাইয়ের কাজ করেছ;  
 আজও ডাইয়ের কাজ কর; আমি ত কিছুই জানিনে।”

“সে জন্য বাস্ত হতে হবে না; সব ঠিক হয়ে যাবে।”



উদ্ভোগ-আয়োজন করিতে বেলা হইয়া গেল। পুরোহিত আসিয়া শ্রাদ্ধের সমস্ত জব্য গোছাইয়া লইলেন। লক্ষী গঙ্গানান করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারে লাগিল। রমেশ ও দুইতিনজন দ্বারের কাছে গেল।

হরেকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বাড়ীতে কি রামকৃষ্ণ বাঁড়ুষো মহাশয় থাকেন ?”

রমেশের আর বুদ্ধিতে বিলম্ব হইল না যে, ইনিই লক্ষীর কাকা হরেকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়। সে বলিল, “আজ্ঞে হাঁ, আপনি বাড়ীর মধ্যে বান। শুক আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। ওরে রামা, জিনিস-গুলো নামাবার ব্যবস্থা করু ভাই।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “দাদা কেমন আছেন ?”

রমেশ বলিল, “বাড়ীর মধ্যে চলুন, সব—”

আর কথা বলিতে হইল না; লক্ষী পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া হরেকৃষ্ণের কোলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, “কাকা গো, কেউ নেই কাকা! সব ভাসিয়ে দিয়েছি।”

হরেকৃষ্ণ এই দৃষ্টাৎ বজ্রপাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; লক্ষীকে বুকের মধ্যে করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন,—একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

রমেশ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া গাড়ীর নিকট গেল; এবং ছোট বধুকে গাড়ী হইতে নামাইল। ছোট বধুও তখন আর

বাড়ীর মধ্যে বাইতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

রামার দলের ছই তিনজন গাড়ী হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া গাড়োয়ানের ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

রমেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, “কাকা মশাই, আর কেঁদে কি করবেন, তাঁদের অদৃষ্টে কাশীপ্রাপ্তি ছিল, হরগৌরীর মত তাঁরা এক-সঙ্গে চলে গেছেন।”

হরেকৃষ্ণ অমীর ভাবে রমেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বড়-বৌ!”

“তানও নেই; ছই মিনিট আগে-পাছে ছইজনই গিয়েছেন।”

“ওরে লক্ষ্মী, তা হ’লে আমাদের কেউ নেই মা! দাদাও নেই, বড়-বৌও নেই। আমি কি দেখতে কাশী এলাম। দাদা গো—”

অনেক বলিয়া-কহিয়া শাস্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া বাওরা হইল।

রমেশ বলিল, “আজ চারদিন; তাই দিদি লক্ষ্মীকে দিয়ে চতুর্থীর কাজটা শেষ করাবার আয়োজন করেছি।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “তাই হোক।”

শ্রদ্ধা কিছুক্ষণের জন্ত বন্ধ রহিল। হরেকৃষ্ণ ও ছোট বধূকে গল্পাঙ্গান করাইয়া আনিবার জন্ত একজন তাঁহাদের সঙ্গে গেল। তাঁহারা স্নান শেষ করিয়া বাসায় আসিলেন।

হরেকৃষ্ণ বস্ত্র-পরিবর্তন করিয়া বাসায় আসিয়া বলিলেন, “আর বিলম্বে কাজ নেই; পুরোহিত মশাই, কার্য আরম্ভ করুন।”

শ্রীছ শেখ হইয়া গেল। ওদিকে রামার দল বাঁরাঘরে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিতেছিল। প্রায় তিনটার সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া গেল। রামার দলের কুড়িজন ব্রাহ্মণ আদিগাছিল। হরেকৃষ্ণ তাহাদের একটাকা করিয়া ভোজন দক্ষিণা দিলেন। তাহারা মজা সন্তুষ্ট হইল। বাইবার সময় রামা বলিল, “দেখ রমেশদা, শোন বিদ্বি-ঠাকরুণ, যখন যা দরকার হবে, কাকের মুখে একটু খবর দিলেই এই রামার দল এসে তা ক’রে দিবে যাবে—একটা মাত্র খবর।”

লক্ষী বলিল, “তোমরা আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে।”

তাহারা চলিয়া গেলে হরেকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এরা কে ?”

রমেশ বলিল, “কাকা মশাই, এরা এই কাশীর একটা বড় গুণ্ডার দল। এদের অসাধ্য কাজ নেই। আমার এরা বাধা। তাই সেদিন সেই বিপদের সময় এদের ডেকেছিলাম; এরাই সাহায্য করেছিল, তাই সেই রাতে শ্রমণের কাজ করতে পেরে-ছিলাম; নইলে এখন কাশীর যে অবস্থা, এরা না এলে কিছুই করতে পারতাম না। সে রাতে জনপ্রতি পাঁচ টাকা দিলেও বাইক পাওরা যেত না। এরা তিন টাকার স্বীকার করেছিল; শেষে কেউ টাকা নিল না; বল্ল, ঐ টাকা দিবে ঘি, চন্দনকাঠ কিনে আমরা এই শব্দ দাহ করব। তাই করল। ওরা বিদ্বি লক্ষীর গুণে একেবারে জল হয়ে গিয়েছে।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “মা আমার এমনই বটে! গা একেব  
আঁধার করে এসেছে। এখন সব কথা শুনি।”

রমেশ বলিল, “সে সব শুনবার সময় আছে। আপনারা একটু  
কিছু মুখে দেন।”

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশনা, কাকা কাকীমা ত ও-সব কিছু খাবেন  
না; শুঁদের রান্নার আয়োজন করে দিতে হবে। তুমিও যে কিছু  
খাও নাই রমেশ দা।”

“আমার জ্ঞাত ভাবে হবে না। এখনই শুঁদের আয়োজন  
করে দিচ্ছি।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “এখন আর নয়; একেবারে সন্ধ্যার পর  
যা হয় করা যাবে। রমেশ, তুমি দুটো খেয়ে নেও।”

“তা কি হয় কাকা মশাই! আপনাদের সেবা হ’লে আমি  
ভবে প্রসাদ পাব।” এই বলিয়া রমেশ কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

হরেকৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীর নিকট রমেশের কথা শুনিলেন, বড়  
কর্তা ও বড় গিন্নীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ শুনিলেন।

লক্ষ্মী বলিল, “কাকা, রমেশ দা মানুষ নয়, ছোতা। সংসারে  
কেউ নেই; বিয়ে করে নাই। স্বভাব একেবারে নির্মল। এমন  
মানুষ দেখি নাই। এই যে বুড়ো হয়েছে, একদিন কোন অগ্রায়  
কাল করে নাই, তামাক-পানটুকু পর্য্যন্ত কখন খায় নাই।  
রমেশ দা না থাকলে আমাদের যে কি হোতো, তা ভাবলেও প্রাণ  
কেমন করে ওঠে।”

রমেশ এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিল, “ও-সব কথা শুনবেন

না কাকা মশাই! আমি অতি সামান্য মানুষ। এই দেখ দিদি লক্ষ্মী, তুমি যে সিধু সিধু করছিলে, তোমার সিধু এসেছে।”

সিধুকে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, “সিধু, তোমার কথা কতবার বলেছি। রমেশ দাশা বলল, তাকে কি খুজে পাওয়া যায়, সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

সিধু বলিল, “তা দিদি, ঘুরে ত বেড়াতেই হয়—ভিক্ষে ত চাই। গাঁজা সিদ্ধি খাই—ও একটা নেশা; ছাড়তে পারিনে; কিন্তু দেখ, এট মিষ্টি কথার নেশা ও-সব নেশার চাইতে বড়—একবারে নেশার রাজা! তোমার কাছে মিষ্টি কথা পেয়েছি, দিন গেলে একবার সে নেশা না করলে কি চলে, কি বল রমেশ দাশ!”

লক্ষ্মী বলিল, “তা বেশ, তুমি একখানা পাতা নিয়ে বোসো সিধু! আমার কাবা এসেছেন, উনি তোমাকে পেট ভরে খাওয়াবেন। কাকা, সেই রাত্রে এই সিধু আমাদের এখানে পাহারা দিয়েছিল। সারা রাত বসে ছিল।”

সিধু বলিল, “সিধু ত প্রথমে গাঁজার লোভেই এসেছিল, বুকলেন ঠাকুর মশাই; কিন্তু তারপর বল দেখি ঠাকুরগণ, কিসের লোভে রোজ একবার করে আসি। ঐ যে বলেছি মিষ্টি কথার নেশায়। পরসী সবাই দিতে পারে;—মিষ্টি কথা, বুকলে, ওটা দেবার লোক বড় বেশী নেই।”

তাহার পর সিধুকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া হরেকৃষ্ণ তাহাকে একটা টাকা দিলেন। সিধু বলিল, “টাকা কি হবে ঠাকুর মশাই, গাঁজার পরসী আজ আছে।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “নিরে রাখ, তুমি আমাদের সেদিন কত উপকার করেছ।”

সিধু মহা আনন্দে চলিয়া গেল। তখন ছোট-বধু লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মী, বাইরে যে কতকগুলো কাঙ্গাল-গরিব এসেছে, তাদের কি অন্ন কিরিয়ে দেবে। তা ত হবে না। আমার দিদি যে কাঙ্গালের মা ছিলেন।”

কথাটা রমেশের কাণে গেল; সে বলিল, “আমি আসা-যাত্রাই মুখ দেখেই চিনেছি, এক কাঙ্গালের মা চলে গিয়েছেন, আর এক কাঙ্গালের মা এসেছেন। সেহস্ত ভাবনা নেই; আমি এই এখনই দোকানে গিয়েছিলাম; বলে এসেছি, তারা এখনই চিড়ে-মুড়কী পাঠিয়ে দেবে। বাইরে ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলেছি। চারটা করে ভূগা দেব, আর চারটা করে পরমা দেব।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “উত্তম ব্যবস্থা করেছ।” তা হলে টাকা নিরে যাও।”

রমেশ বলিল, “টাকার দরকার নেই; আমার কাছে টাকা আছে, ভাতেই হবে।”

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশ দা, তুমি ত সব পঁচিশটা টাকা কাঁপল নিরেছ। তা দিবে কি এত হতে পারে—খরচ যে অনেক হয়ে গেল।”

রমেশ বলিল, “দিদি লক্ষ্মী, তোমার ত বলেছি, হিসেব

আমি কাউকে দেই নি, দেবও না। টাকা আছে, খরচ করছি, বাস্।”

লক্ষ্মী বলিল, “কাকা, বুঝেছ কথটা। রমেশ দা, নিজের টাকা খরচ করছে।”

রমেশ বলিল, “শুনলেন কাকাবাবু, টাকা আবার কারো যেন নিজের হয়। টাকা কারো না; সে কারো ধার ধারে না,—টাকা টাকার। থাক্গে, এখন একটু বসি। এই চিড়ে-মুড়কীগুলো এলে ওদের বিদেয় করতে পারলেই হয়।”

কিছুক্ষণ পরেই কাশ্মালী-বিদায় হইয়া গেল। প্রায় একশত কাশ্মালী আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মী ও ছোট-বধু পাক করিতে গেলেন। তখন হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “রমেশ, বা শুনলাম, তাতে ত তুমি আমাদের ছেলেরও বেশী। তোমার ধার আমরা জীবনেও শোধ করতে পারব না। তারপর, দাদা আর বড়-বৌ কেন এখানে এসেছিলেন, সে সবই তুমি শুনেছ, সবই তুমি জান। এখন কৰ্ত্তব্য কি?”

রমেশ বলিল, “আপনি কি ভেবেছেন, তাই বলুন।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “আমি স্থির করিলাম, তোমরা এখানে থাক, আমি একেলা একবার বাড়ী যাই। সেখানে বা কিছু আছে, বেচে-কিনে, দিগ্গ-বজ্জমানদের কাছে চিরবিদায় নিয়ে আমি চলে আস্‌ব। তারপর যে কয়দিন বাঁচি, লক্ষ্মীকে বুকে করে কাশ্মীতে কাটিয়ে দেব। দেখে আর ধাব না;

সমাজের ধার আর ধারব না। কাকনপুরের বাঁড়ুয়া বংশ  
 লোপ পায়, পাবে; পুত্র মত কাজ করতে পারব না।  
 তাই পারব না বলেই দাদাকে বড়-বোকে এখানে পাঠিয়ে-  
 ছিলাম। তাঁরা চলে গেলেন। এখন আমাকেও তাই করতে  
 হবে। লক্ষ্মীকে আমি কিছুতেই ফেলতে পারব না;—কোন  
 মতেই নয়।”

“দিদিলক্ষ্মী কি এতে স্বীকার হবে।”

“তাকে ত জিজ্ঞাসা করতে যাব না। আমার যা কর্তব্য,  
 আমি তাই করব। দাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর আদেশ  
 পালন করেছি; কিন্তু রমেশ, লক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাঁর আদেশও  
 আমি মাথা পেতে নিতে পারিনি। আজ তিনি চলে গেছেন,  
 বড়-বো চলে গেছেন। এখন আমার কি? আমি যা মনে  
 করেছি, তাই করব। যে সমাজে ব্যভিচারকে প্রশংসা দেয়,—  
 যে সমাজ পাপকে গোপন করে রেখে ধার্মিক মেজে বেড়াতে  
 চায়, সে সমাজ আর আমি চাইনে। বল ত—তুমিই বল,  
 লক্ষ্মীর অপরাধ কি? কি অপরাধে তাকে দণ্ড দিতে যাব?  
 সে আমার দ্বারা হবে না—আমি তা পারব না; তাতে সমাজ  
 ছাড়তে হয়, আত্মীয়-স্বজন ছাড়তে হয়—এখন কি আমার জীব  
 যদি আমাদের ছেড়ে যেতে চান, যাবেন;—আমি ঐ হতভাগিনীকে  
 নিয়ে জীবন কাটাব। তাকে আমি ফেলতে পারব না।”

রমেশ হুই হাতে হরেকৃষ্ণের পায়ের ধূলো মাথায় দিয়া  
 বলিল, “হাঁ, মানুষের মত কথা বটে।”



“তা হলে এই ঠিক রইল। দুই-একদিন পরেই আমি বাড়ী চলে যাব। তারপর সব ঠিকঠাক করে আস্তে আমার মাসখানেক-দেড়েক বিলম্ব হবে। সাতপুরুষের বাস—ভেঙ্গে আস্তে হবে; একটু দেরী হবেই। ততদিন তোমার উপর সব ভার। আমি টাকা রেখে যাব। এ বাড়ীতে যখন দাদা বড়-বৌ চজন মারা গেলেন, তখনই এখানে আর, থেকে কাজ নেই। আর একটা ছোট দেখে বাড়ী ঠিক কর। সেখানেই উঠে যাব। দেখ, আমি সব বেচে-ফিনে চার পাঁচ হাজার টাকার বেশীই নিয়ে আস্তে পারব। তারপর যা হয় দেখা যাবে।”

রমেশ এ প্রস্তাবের কোন উত্তরই করিল না। সে বলিল, “যাক ও-সব কথা এখন, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি দেখিগে ওঁরা রান্নাঘরে কি করছেন।”

এই বলিয়া রমেশ উঠিয়া গেল। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে সে ত কিছুই বলিতে পারে না; সেই রাজিতেই ত লক্ষ্মীকে হইয়া সে পলায়ন করিবে; কাশীর এক দূর প্রান্তে সে ত বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়াছে; জিনিষ পত্রও সামান্য সেখানে রাখিয়া আসিয়াছে। এ কয়দিন ত সে ঐ চেঁচাতেই ফিরিয়াছে। আর হরেকৃষ্ণ যে এই কথা বলিবেন, তক্ষা লক্ষী তাহাকে পূর্কেই বলিয়াছিল। এ প্রস্তাবে লক্ষী যে কিছুতেই সম্মত হইতে পারে না, তাহাও তাহার হির করিয়াছিল। তাই রমেশ কোন মতই প্রকাশ করিবে না।

আহারাদি শেষ হইতে একটু রাজি হইয়া গেল। হরেকৃষ্ণ

তিন দিনের পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহার পর এই শোক । তিনি একটা ঘরে শয়ন করিলেন। ছোট-বধুও ক্লান্ত হইয়াছিলেন ; তিনিও লক্ষ্মীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া দুই একটা কথা বলিতে-বলিতে নিদ্রাভিভূতা হইলেন ।

লক্ষ্মীর চক্ষে নিদ্রা নাই। আজ যে সে এতদিনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন্ এক অন্ধকার পথে বাহির হইবে ; — তাহার কি নিদ্রা আসে। এই সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনের ঘটনা আজ তাহার মানস-পটে উদ্ভিত হইতে লাগিল ; তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে তখন যে কত কথা উঠিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য ।

লক্ষ্মী যখন দেখিল যে, সকলেই নিদ্রিত হইয়াছেন, তখন সে প্রাণীপের কাছে বসিয়া একখানি পত্র লিখিতে লাগিল। পত্রখানি ছোট ; কিন্তু তাহার যে কলম চলে না। এক-এক-বার চক্ষের জল মুছিয়া ফেলে, আবার এক লাইন লেখে ; — আবার বসিয়া ভাবে ; আবার কাঁদে ; — আবার কলম তুলিয়া লইয়া লিখিতে বসে ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর সেই ক্ষুদ্র পত্রখানি ধীরে ধীরে বিছানার উপর রাখিয়া দিল। তাহার পর নিদ্রিতা কাকীমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। আর যে সে স্নেহ-মাথা মুখ সে দেখিতে পাইবে না—আর যে ‘কাকীমা’ বলিয়া আদর করিয়া কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিতে পাইবে না। আর একটু পরেই সব শেষ হইবে,—সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া

যাইবে। লক্ষ্মী তখন একাকিনী হইবে। এই সংসারের সহিত  
 তাহাকে একাকিনী যুদ্ধ করিতে হইবে। ভরসা ভগবান—ভরসা  
 ঐ সৰ্ব্বনিয়ন্তা বাবা বিশ্বনাথ।

লক্ষ্মী আর অধিকক্ষণ ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিতে পারিল না,  
 কি জ্ঞান যদি তাহার কাকী-মা হঠাৎ জাগ্রদা উঠেন। তাহা  
 হইলে ত তাহার আর যাওয়া হইবে না। সে তখন ধীরে-ধীরে  
 বারান্দায় আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

রমেশও বাহিরে বাসিয়াই আছে; তাহারও অপার ভাবনা।  
 ভীষনের এই শেষ ভাগে এ কি বিবশ, কি গুরুতর দায়িত্ব সে  
 মাথায় লইতেছে। একবার মনে হইতেছে, কাজ নেই, লক্ষ্মীকে  
 নিবৃত্ত করি, এ অন্ধকারে পা ফেলিয়া কাজ নাই। পরক্ষণেই  
 মনে হইতেছে, তাহার মা-ঠাকরুণের সেই অন্তিম অনুরোধ—  
 তাহার মৃত্যুশয্যার কথা—প্রতিজ্ঞার কথা। শেষে তাহার  
 প্রতিজ্ঞারই জয় হইল। সে মনে মনে বলিল, “যা থাকে অঙ্কুশে  
 তাই হবে। লক্ষ্মীদিদিকে লইয়া আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ  
 দিব। এতদিন পরের ভাবনা ভাবি নাই, নিজের ভাবনাও ভাবি  
 নাই;—এখন একবার পরের ভাবনাই ভাবি। আর আমিই  
 বা ভাবতে যাই কেন ? আমি কে ? আমি কি ? কিছু না—কিছু  
 নী। ওরে ‘আমি’, তুই একটু সরে যা। তুই আমাকে এ কাজে  
 শ্বাধা দিবি; তুই সঙ্গে থাকলে সব নষ্ট হবে। এস ‘তুমি’—ওগো  
 ‘তুমি’—সব কাজ কর—লক্ষ্মীকে রক্ষা কর। লক্ষ্মীর ভার  
 লও।”

এই সময় লক্ষ্মী বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশ উঠিয়া বলিল, “এসেছ দিদি লক্ষ্মী, চল। ঐ দেখ, বাবা বিশ্বনাথ পথ দেখাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। এই রমেশের মুখের দিকে চেয়ো না—চেরো না, তা হলে পড়ে যাবে,—এ পথে চলতে পারবে না। চাও ঐ বিশ্বনাথের দিকে! চল, চল, দিদি, তিনি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।”

রমেশের কথা শুনিয়া লক্ষ্মীর শরীর রোমাঞ্চ হইল। সে বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সত্যই বিশ্বনাথ পথের উপর দাঁড়িয়া আছেন। আর ত দেবী করা চলে না!

সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্মী বলিল, “চল, রমেশ দাদা!” এই বলিয়াই একটু চুপ করিল। হায় অভাগিনী, এখনও মায়া—এখনও কাকা! লক্ষ্মী বলিল, “রমেশদা, কাকাকে একবার দেখে যাব না—আনার কাকা—” কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

ককের দ্বার একটু খোলা ছিল। লক্ষ্মী দ্বার আর একটু খুলিল। হরেকৃষ্ণ বোধ হয় তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; তিনি স্বপ্নে সেই বলিয়া উঠিলেন—

“লক্ষ্মী—মা আমার।”

লক্ষ্মীর আর পা চলিল না। এ কি মায়া! এগো, এ কি খেলা! লক্ষ্মী ছই-পা সরিয়া আসিয়া ভূমিতলে মস্তক ঠেকাইয়া বলিল, “কাকা যাই!”

তাহার পরই কোন দিকে না চাহিয়া, রমেশকেও না ডাকিয়া এক বস্ত্রে বিনা সঞ্চলে, পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমেশও প্রস্তুত ছিল। সে নিকটে আসিলে লক্ষ্মী বলিল, "চপ  
রমেশ দা, জোরে চল—জোরে—জোরে" বলিয়া অগ্রসর হইল।

রামশ কিছুদূর পিছান পিছনে যাইয়া বলিল, "দিদি লক্ষ্মী, বড়  
রাস্তায় গেলে চলবে না। গলি দিয়ে যেতে হবে। এত রাত্রিতে  
বড় রাস্তায় পাহারাওয়ালারা, পুলিশের লোক থাকে। এই  
পথে এস।" বলিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে  
প্রবেশ করিল। তাহার পর এগলি-ওগলি দিয়া অনেকটা পথ  
অতিক্রম করিয়া, একটা অতি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে ঘোর অন্ধকারে  
প্রবেশ করিল। একটু যাইয়াই একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল;  
কোঁচার খুঁট হইতে চাবি লইয়া সেই বাড়ীর দ্বারের তালা  
খুলিল।

লক্ষ্মী তাকীতাকী প্রবেশ করিতে যাইতেছিল; রমেশ বলিল,  
"একটু দাঁড়াও দিদি লক্ষ্মী, আলোটা জ্বালি। সব ঠিক আছে।  
অন্ধকারে অজানা বাড়ীতে যেতে পারবে না।" এই বলিয়া সে  
ভিতরে প্রবেশ করিয়াই আলো জ্বালিল এবং পথ দেখাইয়া একটা  
ছোট সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া উঠিল।

বাড়ীটা অতি ছোট। উপরে একটা ঘর ও একটা বায়ান্দা;  
নীচে দুইটা ঘর; সম্মুখে ছোট একটা উঠান; তাহারই পার্শ্বে  
কান্নাঘর ও একদিকে পাইখানা। বাড়ীটা একেবারে নুতন।

রমেশ লক্ষ্মীকে উপরে লইয়া গিয়া, ঘরটা খুলিয়া দিল। লক্ষ্মী ঘরের  
মেজের বসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা গো—ও মা—কাকাগো।"



প্রাতঃকালে হরেকৃষ্ণের প্রথমে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া দেখেন, দ্বার খোলা রহিয়াছে। বারান্দায় আসিয়া দেখেন, রমেশ নাই। মনে করিলেন, রমেশ উঠিয়া কোথাও গিয়াছে। তখন ধীরে-ধীরে পাশের ঘরের দিকে গেলেন; দেখেন সে ঘরও খোলা। ঘরের নিকট হইতে ডাকলেন, “লক্ষ্মী!”

শব্দ শুনিয়াই ছোটবধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “লক্ষ্মী কৈ?”

ছোট বধু বলিলেন, “বোধ হয় বাইরে গেছে। তাই ত সকাল হয়ে গেছে! লক্ষ্মী যে বলেছিল, রাত থাকতে উঠে, আমাকে নিধে গঙ্গান্নানে যাবে।” এই বলিয়া খাটের উপর হইতে নামিতে গিয়াই দেখেন, বিছানার উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে।

ছোট বধু বলিলেন, “বিছানার উপর কার এ চিঠি!” এই বলিয়া চিঠিখানি তুলিয়া দেখিয়াই বলিলেন, “ওগো, এ যে তোমার নামে চিঠি, হাতের লেখা যে লক্ষ্মীর!” বলিয়াই তিনি বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন।

“আমার নামের চিঠি! লক্ষ্মীর হাতের লেখা বল কি?” বলিয়াই হরেকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঘরে তখনও সামান্য অন্ধকার ছিল। তিনি চিঠিখানি লইয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটু পড়িয়াই বসিয়া পড়িলেন; আর পড়া হইল না; চীৎকার করিয়া বলিলেন, “সর্বনাশ হয়েছে, লক্ষ্মী চলে গিয়েছে। লক্ষ্মী, মা, লক্ষ্মী আমার!”

ছোট-বধু তখন দৌড়িয়া বাহিরে আসিয়া চিঠিখানি লইয়া  
পড়িলেন। চিঠিখানি এই—

শ্রীশ্রীচরণকমলেশু,

কাকা, আমি হস্তের মত চলিলাম। বাবা মা যে দিন মারা  
যান, সেইদিনই বাইতাম। যাইতে পারি নাই; জানিতাম  
তোমরা আসবে। তোমাদের একবার না দেখিয়া, তোমাদের  
মুখে মা লক্ষ্মী ডাক না শুনিয়া বাইতে পারি নাই। তোমাদের  
সঙ্গে দেখা হইয়াছে। এখন চলিলাম। তুমি আমার কত সব  
ছাড়িতে পার, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাহা হইতে পারে না;  
বাপ-পত্নীমহের নাম তুমি ডুবাইতে পারিবে না, বংশলোপ  
করিতে পাইবে না। তাহা আমি করিতে দিব না। তাই  
চলিলাম। আমার অনুসন্ধান করিও না, খুঁজিয়া পাইবে না।  
স্থির জানিও, তোমার ভাইঝি কুপথে যাইবে না। সে প্রাণ দিয়া  
তাহার বন্দু রক্ষা করিবে। দেবতার মত রমেশদা তাহার সহায়  
থাকিবে। তোমরা বাড়ী যাও। বাবা মার মৃত্যু-সংসার সত্য  
সংবাদ। সেই সঙ্গে সমাজের দিকে চাহিয়া একটা মিথ্যা  
সংবাদও করিও,—লক্ষ্মীও মারা গিয়াছে। কত জন কত  
করে, তুমি এইটুকু মিথ্যা বলিও। তোমাদের কাছে আজ  
হইতে আমি মৃত, একথা ঠিক। কাকীমাকে আমার শ্রেণাম  
দিও। আর একটা অনুরোধ কাকা! অভাগিনী কস্তার কথা  
এক-একবার মনে করিও। আর আশীর্বাদ করিও, আমি যেন

শীত মরি। কাঁকা তোমার কথাই অবাধ্য হইলাম। কিন্তু আর কোন উপায় বা পথ দেখিলাম না।

লক্ষ্মী।

কে শুনিবে তাঁহাদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন! কেহ নাই—কেহ নাই!

এই অপরিচিত সহরে কোথায় তাঁহারা লক্ষ্মীর অমুসন্ধান করিবেন? তবুও দুইতিনদিন নানা স্থানে ঘুরিলেন। সত্যবাবুর যে সরকারটা কাশীতে ছিল, সেও কয়েক দিন অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ফলই হইল না। সরকার তাঁহাদিগকে বলিল, “কোন ভয় করবেন না। রমেশ খাঁটি মানুষ। অমন মানুষ হয় না। তার দ্বারা আপনাদের মেয়ের কোন অনিষ্ট হবে না, এ কথা আমি খুব বলতে পারি। আপনাদের ঠিকানা আমাকে দিবে আপনারা দেশে যান। যখনই কোন সংবাদ পাব, তখনই আপনাকে জানাব।”

হরেকৃষ্ণ আর কি করিবেন। তিন চারি দিন তুখাঁ অমুসন্ধান করিয়া, অবশেষে বাড়ী-ভাড়া মিটাইয়া দিয়া এবং সরকারের হাতে ধরিয়া, সংবাদ দিবার জন্ত বারবার অনুরোধ করিয়া, সোণার কমল কাশীর জন-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।



রমেশ প্রথম ছই তিন দিন দিবাভাগে বাহির হইত না, কিনি রাত্তার যদি হরেকৃষ্ণের সহিত দেখা হয়। তাহার পর সে কোন প্রকারে সংবাদ পাইল যে, হরেকৃষ্ণ দেশে চলিয়া গিয়াছেন ; তখন সে হাট-বাজার করিবার জন্ত দিনেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল।

এ কয়দিনে সে একটা কথা বৃষ্টিতে পারিয়াছিল। সে দেখিল, এখন একাকিনী অবস্থায় লক্ষ্মীকে রাখা সম্ভব নহে ; ইহা যে তাহার পক্ষে নির্জন কারাবাস হইল। এ ভাবে বাস করিলে তাহার শরীর মন দুইই অল্পদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তাহার পর, যখন তাহার প্রসবের সময় উপস্থিত হইবে, তখনই বা সে কি করিবে ? কে তাহার সেবা করিবে, কে পথ্য দিবে ? পূর্বে এ সকল কথা তাহার মনে উঠে নাই ; এখন এই নির্জন গৃহে বাসিয়া সে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল।

সে বেশ বুঝিল, লক্ষ্মীর সঙ্গিনী দরকার। গৃহের সামান্য কাজকর্মের আর কতটুকু সময় লাগে ? অবশিষ্ট সময় তাহার মত নিরক্ষর বৃদ্ধের সঙ্গে এমন কি কথায় সে কাটাইতে পারে ? তাহার শরীর না হয় এখন ভাল আছে ; কিন্তু, বিশ্বনাথ না করুন, যদি সে দুইদিন অস্থির হয়, তখন তাহার ডাত-জল

কে দিবে ? ব্রাহ্মণকন্যা ত তাহার রান্না কোন জব্য খাইতে পারে না ; আর সে-ই বা এমন কাজ করিবে কেন ?

কিন্তু সে বিশ্বাস করিয়া ভার দিতে পারে, এমন জ্বীলোক ত অনেক চিন্তা করিয়াও খুঁজিয়া পাইল না। কাশীর মত স্থানে কত জন যে কত ভেক ধরিয়া আছে, তাহা ত তাহার অগোচর নাই। চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সে অনেক দেখিয়াছে, অনেক ঠেকিয়াছে, অনেক শিখিয়াছে। বাহাকে ছয় মাস দেখিল বেশ শুদ্ধ, শাস্ত, বেশ ধর্মপরায়ণ ; তাহার পরই তাহার কীর্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কত বাভিচারী বাভিচারিণী, কত নরহস্তা যে, এখানে সাধু-সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে দ্বিতীয় শ্রমোণের অপেক্ষা করিতেছে, তাহা ত সে জানে। এই কাশীতে সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না,—রমেশ ঠেকিয়া শিখিয়া এ কথা মর্মে-মর্মে বুঝিয়াছে। এ অবস্থায় সে কি করিবে ? অথচ শীঘ্রই কিছু করা দরকার।

হঠাৎ একজনের কথা তাহার মনে হইল। বিগত দশ বৎসর সে এক ব্রহ্মচারিণীকে দেখিয়া আসিতেছে ; যখন-তখন অবসর সময়ে সে এই ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে বাসিত। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে সে তাহার কোন পরিবর্তন দেখে নাই ; কিন্তু তবুও সে তাহার সম্বন্ধে একেবারে একটা উচ্চ ধারণা করিতে পারে নাই। হাঁ, তবে ব্রহ্মচারিণী ভাল বটে,—এইমাত্র ভাব তাহার মনে স্থান পাইয়াছিল।

ব্রহ্মচারিণী এই দশ বৎসর কাশীতে আছেন। দুর্গাবাড়ীর

অদূরবর্তী একটা দেবতা-পরিভাস্ত্র মন্দিরে তিনি বাস করেন ;  
 সঙ্গী বা সঙ্গিনী কেহ নাই। এত দিনের মধ্যে কাহাকেও  
 চেনা করেন নাই, বা কোন প্রকার আড়ম্বরও করেন নাই।  
 একাকিনী থাকেন ; যে বাহা দিয়া যায়, তাহাই আহাৰ করেন।  
 যে দিন কিছু না জোটে, উপবাস করেন। কোন দিন ভিক্ষায়  
 বাহির হন না। ঠাকুর-দেবতা দর্শন করিতেও কখন যান না।  
 অতি প্রত্যুষে একবার গঙ্গাস্নান করিতে যান ; সূর্য্যের অন্তিম  
 কালেই কিরিয়া আসেন। সকলেই বলে, ব্রহ্মচারিণী খাঁটি মানুষ।  
 কতজন তাঁহার শিষ্য-শিষ্যা হইতে চেষ্টা করিয়াছে ; তিনি প্রত্যা-  
 খ্যান করিয়াছেন ; কতজন তাঁহার আশ্রম প্রস্তুত করিয়া,  
 তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে ;  
 তিনি ভাগ্যতে কর্ণপাত করেন নাই। পার্শ্ববর্তী লোকেরা  
 বলে, মধ্যে-মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ঐ মন্দিরে আসেন ; দুই  
 চারি ঘণ্টা ব্রহ্মচারিণীর সহিত কথাবার্তা বলিয়া আবার কোথায়  
 চলিয়া যান। রমেশও এ সকল দেখিয়াছে। তবে তাহার  
 কঠোর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয় নাই। সে যাইত আসিত ;  
 ব্রহ্মচারিণী তাহার সহিত দুই চারিটা কথাও বলিতেন,—ভাল  
 কথাই বলিতেন।

এতদিন রমেশের কোন প্রয়োজন হয় নাই ; তাই সে  
 ব্রহ্মচারিণীকে কোন কথাই বলে নাই, কোন উপদেশও প্রার্থনা  
 করে নাই ;—ও সব তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই  
 মেয়েটির ভার লইয়া সে যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে ! তাই এই

ব্রহ্মচারিণীর কথা তাহার মনে হইল। সে মনে মনে বলিল,  
 “দেখি না, ইনি কি বলেন। পরামর্শ জিজ্ঞাসায় কতি কি।  
 মনের মত হয়, বিশ্বাস হয়, গ্রহণ করিব; না হয়, চলিয়া  
 আসিব।”

এই ভাবিয়া একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে লক্ষ্মীকে বলিল, “দিদি  
 লক্ষ্মী, আমি একটা কাজের জন্ত একটু বাইরে যাব। দেবী  
 হবে না, এই ষণ্টাখানেকের মধ্যেই আসব। তুমি বাইরের  
 ছয়টি বন্দ করে দিবে যাও ত।”

রমেশ সকালে ও বিকালে বাজার করিতে যাওয়া ব্যতীত  
 এ কয়দিন আর বাহিরে যার নাই; আজ এই অসময়ে তাকে  
 বাহিরে যাইতে দেখিয়া লক্ষ্মী বলিল, “রমেশনা, তুমি বুঝি টাকা  
 আন্তে যাচ্ছ? দেখ, আমার একটা ভাবনা হয়েছে। তুমি  
 এই যে খরচ করছ, তারপর? যখন তোমার টাকা ফুরিয়ে যাবে,  
 তখন কি হবে?”

রমেশ বলিল, “তার অনেক দেবী আছে। এতদিনের মধ্যে  
 যা হয় একটা হয়ে যাবে। আমিই কি আর বসে থাকব।  
 এই কটা মাস যাক না। তারপর কি করণ জান? এ বাড়ী  
 ছেড়ে দেব। সমর রাস্তায় একটা ছোট বাড়ী নেব। তার  
 বাইরের দিকের ঘরে একটা দোকান করব। সেই দোকান  
 থেকে ষা লাভ হবে, তাইতে আমাদের বেশ চলে যাবে।  
 সে সব আমি ভেবে-চিন্তে রেখেছি। কয়টা মাস কোন রকমে  
 কাটাতে পারলেই হয়। টাকার কথা বল্ছিলে দিদি লক্ষ্মী!”

না, টাকাই এখন দরকার নেই। কুঠি থেকে যা এনেছি, তাতে বাড়ী-ভাড়া দিয়েও দুতিন মাস চলে যাবে।

লক্ষী বলিল, “রমেশদা, আমার জন্ত তুমি তোমার এই এত কষ্টে জমান টাকা খরচ করছ; আমি ত কোন দিন এর একটা পরসাগ শোধ করতে পারব না—আমার কোনই উপায় নাই।”

“কে তোমাকে শোধ করতে বলছে দিদি লক্ষী! কার জমান টাকা? টাকা বুঝি এতকাল আমি জমিয়ে রেখেছি। তুমি এত শাস্ত্র পড়েছ, এত তোমার বুদ্ধি; তুমি এই কথাটা বুঝতে পার না, এতেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমার ঘর নেই, সংসার নেই; আপনার বলতে কেউ নেই,—আমি টাকা জমাতে বাব কেন? কার জন্তে? কথাটা কি জান দিদি! ছেলে মাটিতে পড়বার আগে তার আহারের জন্ত মায়ের বুকের রক্ত ফীর করে রাখে কে জান? পাহাড়ের পাৰাণ ভেঙ্গে গঙ্গা বইয়ে যেছেন কে জান? যিনি এই সব খেলা দিন-রাত খেলছেন, তিনি সব দেখেন, সব জানেন! তুমি এমনই করে আসবে জেনে, তিনি এই আমার হাত দিয়ে টাকা জমিয়ে রাখছিলেন। আমিই কি তা জানতাম, না বুঝতাম। এখন দেখছি, আর আবাক হয়ে বাছি। এ তোমার টাকা দিদি! সব তোমার,—তোমারই জন্ত এ টাকা কুঠিতে জমা হয়ে আসছিল। এখন খরচ হচ্ছে। এর একটা পরসাগ তোমার রমেশ দাদার নয়। তার ত রমেশ দাদা! লেখা জানে না, পড়া জানে না;—

সে তোর ভার নেবে! তার সাধা কি! বাক্, ও সব কিছু তেব না; এখন দোরটা বন্ধ করে দেও; আমি একটু ঘুর আসি।" এই বলিয়া রমেশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল; এবং যখন দেখিল, দ্বার বন্ধ হইল, তখন হুর্গাবাড়ীর দিকে চলিল।

ব্রহ্মচারিণী যে মন্দিরে বাস করেন, তাহার নিকটে বাইতেই রমেশ দেখিল, মন্দিরের বাহিরে অপ্রশস্ত চাতালে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিণী বসিয়া আছেন। রমেশ মনে করিল, এ সময় বাইয়া কাজ নাই, ফিরিয়া বাই; আর এক সময় আসিব। পরক্ষণেই মনে করিল, না, যখন আসিয়াছি, তখন আর ফিরিব না; বেথা করিয়াই বাই।

রমেশ ধীরে-ধীরে সেই চাতালের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল; —সে এতকাল কাহাকেও প্রণাম করে নাই,—ঠাকুর-দেবতা কেও না, মানুষকে ত নয়-ই। সে প্রণাম করিল না।

সে শুনিতে পাইল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণীকে বলিতেছেন,—  
 "দেখ মা, সেবাধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তোমাকে যে এই দ্বারশ বৎসর এত শিক্ষা দিলাম, তা এই সেবাধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য। তাই আমি এসেছি,—সে সুযোগও উপস্থিত।"

ব্রহ্মচারিণীর কৃষ্টি এইবার রমেশের দিকে পড়িল। তিনি" লহাস্তবদনে বলিলেন, "রমেশ, অনেকদিন তুমি এ দিকে এসনি।"

রমেশ বলিল, "অনেকদিনই আসতে পারি নি। আজ একটু বিপদে পড়েই এসেছি।

ব্রহ্মচারিণী হাসিয়া বলিলেন, “বিপদ! তোমার বিপদ!  
তুমি যে মুক্ত পুরুষ।”

বুদ্ধ সন্ন্যাসী সচাস্ত্রমুখে বলিলেন, “মুক্ত পুরুষকেও মাঝে-  
মাঝে বন্ধন পড়তে হয় মা! তুমিও মুক্ত, কিন্তু তোমার  
জন্তও বন্ধন তৈরী হয়েছে; এখনই জান্তে পারবে।”

ব্রহ্মচারিণী রমেশকে বলিলেন, “কি বিপদ তোমার রমেশ।  
ইনি আমার গুরুদেব।”

রমেশ বলিল, “তা আমি জানি। সে ভালই হোল, গুরু-  
শিষ্যা দুইজনের কাছেই এক সঙ্গে কথাটা জানান হবে।” এই  
বলিয়া রমেশ সেই চাতালের সিঁড়িতে বসিয়া লক্ষ্মীর কথা  
আলোচনা করিতে বলিল। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিণী তদ্বয় ভাবে এই  
কাহিনী শুনিতা যাইতে লাগিলেন; কথার মধ্যে বাধা দিয়া  
কোন কথাই বলিলেন না।

রমেশের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন,  
“মা, সেবাধর্ষের কথা, আর তার সুরোগের কথা এইমাত্র  
তোমাকে বল্ছিলাম। এই দেখ সুরোগ উপস্থিত। এই সেবার  
তোমাকে দীক্ষিত করবার জন্তই আমি আজ এসেছি।”

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, “আমাকে এখন কি করতে হবে,  
আজ্ঞা করুন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “এই মেয়েটির ভার তোমাকে নিতে  
হবে। যাও তার মঙ্গল হয়, তার ভার তোমার উপর রইল।  
আর তুমি যাকে মুক্ত পুরুষ বল্ছ, সে তোমার সহকারী হবে।

দেখ এই মেয়েটির একটি কল্প-সন্ধান হবে; তার লালন-পালন, শিক্ষাবিধানের ভার তোমাকে নিতে হবে। আর এই যে লক্ষ্মীর নাম শুনলে, সেই লক্ষ্মীকে সর্ব্বপ্রকারে লক্ষ্মী করে তুলবার কাজও তোমার উপর রইল। জিনিষ খাঁটি, তোমরা ছুটি কারিগরও ওস্তাদ! ছইজনই মুক্ত। এখন কিছুদিন এই ব্রত তোমাদের নিতে হবে; সাধন-ভজন, জপ তপ—সর্ব্বত্র এর বাড়া আর ধর্ম নেই না। তোমার বধেষ্ঠ অর্থ আছে। এই দ্বাদশ বৎসর তার একটি পরসায় তোমাকে স্পর্শ করতে দিই নাই;—তোমাকে কঠোর করতে শিখিয়েছি। এখন যাও, সেই অর্থের সদ্যবহার কর। এ মন্দির ত্যাগ কর। তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি জয়যুক্ত হবে। তোমাকেও আশীর্বাদ করছি রমেশ, তোমারও জয় হোক। আমি সর্ব্বদা আসুব, তোমাদের খোঁজ নেব। যখন যেমন করতে হবে, বলে যাব। দ্বাদশ বৎসর এই ব্রত পালন করতে হবে—একাগ্রচিত্তে পালন করতে হবে। তারপর যা ব্যবস্থা, দ্বাদশ বৎসর পরে আমি তা করব।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গাজোথান করিলেন। ব্রহ্মচারিণী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—আজ ত আর তিনি ব্রহ্মচারিণী নহেন। রমেশের উন্নত মস্তক আজ নত হইল; সেও প্রপঞ্চে সন্ন্যাসী, তাহার পর এই দেবীকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় কথাটীও না বলিয়া চলিয়া গেলেন।



দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাশীর কেশীঘাটের উপর একখানি নাতিবৃহৎ ভবনের একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে অজিনাসনে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট; পার্শ্বে ধরাসনে ছইটা ব্রহ্মচারিণী;—ছইটাই মাতৃমূর্তি; দুইজনকেই দেখিলে জগদ্ধাত্রী বলিয়া মনে হয়।

সন্ন্যাসী বয়োধিকা ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, “মা সরস্বতী, তোমার দ্বাদশ-বৎসরব্যাপী সেবার ফল হইয়াছে।”

ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, “ফলের প্রত্যাশা ত কার নাই প্রভু! আপনি কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, প্রাণপণে একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়াছি।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “সেই কাজের ফলেই আজ সমস্ত কাশী—  
• আর কাশীই বা বলি কেন—সমস্ত ভারতে লক্ষ্মীর নাম কীৰ্ত্তিত হইতেছে। মা লক্ষ্মী, আমি এই দ্বাদশ বৎসর তোমার জীবন-  
গঠনে সহায়তা করিয়াছি মা! বল, আজ তুমি কি চাও?”

• লক্ষ্মী বলিল, “কোন দিন কিছু চাই নাই; চাহিবার জ  
কোন অবকাশ ঘেন নাই প্রভু! তবে আজ একটা প্রার্থনা আছে;  
—আমাকে অব্যাহতি দিন—আমাকে অন্তর্হিত হইতে দিন।  
চারিদিকের এ কোলাহল হইতে আমাকে দূরে অপস্থত করুন।”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “ভয় নাই মা ! তোমাকে আমি জানি । এই যে তোমার নাম, তোমার বর্ণ, তোমার ব্রহ্মচর্যের নিপুল কাহিনী দেশে-দেশে প্রচারিত হইয়াছে ; তোমার জন-সেবা দর্শনে লোকে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে তোমার নাম স্মরণ করিতেছে ; কাশীর লক্ষ্মী আশ্রম তোমার নাম ঘোষণা করিতেছে ; ইহাই তোমার পরীক্ষা ! কেহ নির্জনে পরীক্ষা দেয়, কাহাকেও বা জনসম্মুখের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হয় । তুমি শেষোক্ত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছে । এখন তুমি কি করিতে চাও, তাহাই আমার জিজ্ঞাসা ।”

লক্ষ্মী বলল, “তাহা আমি জানি না প্রভু ! সে কথা ত কোন দিন ভাবি নাই,—সে চিন্তা ত কোন দিন আমার মনে উঠিবার অবকাশ পায় নাই ।”

“তোমার কত্তার কথা কিছু জাবিদ্ধাছ ?”

“আমার কত্তা ! না প্রভু, কত্তা ত আমার নয় । আমি যে ষাটশ বৎসর পূর্বে তাহাকে বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি । তাহার কথা ত ভাবি নাই—একদিনের জন্তও ভাবি নাই । সে তার ত প্রভু আমার উপর দেন নাই । প্রথম বধন আপনি আমাকে এখান হইতে সরাইয়া গিয়া গেলেন ; দেবীর উপর, আর রমেশ দাদার উপর সে ভার দিলেন, তখন এক-একবার মন কেমন হইত, এ কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব । কিন্তু দেখিলাম, এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, নতুবা আপনার ঐদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে পারিব না । তাহার পর

হইতে আর সে চিন্তা আমি মনে স্থান দিই নাই,—স্থান দিলে  
আপনার সেবার অধিকার লাভ করিতে পারিতাম না—নর-নারা-  
য়ণের সেবাগ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতাম না।”

সরস্বতী বলিলেন, “দিদি লক্ষ্মী, আজ বার বৎসর তোমার ধন  
রক্ষা করিলাম, গুরুদেবের আদেশ মত তাহাকে লালন-পালন  
করিলাম। এখন তাহাকে তুমি বুঝিয়া লও। আমাদের ছুটি।”

রমেশও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; সেও বলিল, “এ বুড়াকেও  
আর কেন! চের শিক্ষা দিলে দিদি! এখন

ভালয় ভালয় ছেড়ে দেগো,

আলোয় আলোয় চলে যাই।”

লক্ষ্মী বলিল, “দিদি, কে কার ছুটির মালিক! ছুটি যে আমি  
অনেক দিন নিয়েছি। আমার ধন কৈ? সাই যে তোমায়,  
আর ঐ রমেশ দাদার। আমি যে মৃত্যু-শয্যাগ পড়ে ঈশানীকে বাবা  
বিখনাথের চরণে সমর্পণ করেছিলাম। তারপর তিনি বাবের দান  
করেছেন, ধন তাঁদের। ও ধনের কাজ আমার নেই—গুরু-  
দেবের কৃপায় আমি অমূল্য ধনের সন্ধান পেয়েছি।” আর  
আমাকে ভুলাতে পারবে না রমেশ দা!”

• • বৃদ্ধ সরাসী বলিলেন, “তোমরা সকলেই দেখছি ছুটি চাও।  
আমরি ছুটির যে অনেক বাকী মা, আমাকে যে এখনও অনেক  
ছুটীকুটী করতে হবে। শোন মা লক্ষ্মী, ঈশানীকে মনের মত করে  
গড়াবার জন্ত বা চেষ্টা করা কর্তব্য, মা সরস্বতী আর রমেশ তা

করেছেন। বাগালী ব্রাহ্মণ-কন্টার বা বা শেখা উচিত, তাকে  
তা শেখান হয়েছে;—সে যাতে লক্ষ্মীর মেয়ে—”

লক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিল, “না প্রভু, সরস্বতীর মেয়ে—”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তাই। সে যাতে সরস্বতীর  
মেয়ে হতে পারে, তার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে; সে চেষ্টা  
সফলও হয়েছে। কিন্তু একটা কাজ যে এখনও বাকী আছে।  
তবে সে দিকেও আমার চেষ্টার জুটি হয় নাই। ঈশানীকে উপযুক্ত  
পাত্রে সমর্পণ করতে পারলেই, মা সরস্বতী, বাবা রমেশ, তোমা-  
দের কার্য শেষ হয়। তারপর ত তোমাদের তিনজনের ছুটি।  
দেখ, ছেলে আমি পেয়েছি। আজ পাই নাই—ছয় বৎসর  
আগেই পেয়েছি। এই ছয় বৎসর আমি তাকে শিক্ষা দিছি।  
বুঝেছ মা সরস্বতী, কে দেই ছেলে। তুমি ত জান, আমার শিষ্য  
ভুবনের ছেলে যাতে লেখাপড়া শেখে, জ্ঞান-ধর্ম বিভূষিত হয়ে  
ঈশানীর উপযুক্ত হয়, তার জন্ত আমি কত সময় দিয়েছি। ঈশানীর  
লেখাপড়া, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ শিখাবার তার তোমাদের উপর  
দিয়েছিলাম; আর ভুবনের ছেলের শিক্ষার ভার আমি দিয়েছিলাম।  
তুমি ত জান মা, কতদিন বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে এই বাড়ীতে  
এসেছি; ঈশানীর সঙ্গে তার লেখাপড়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা  
করবার অবকাশ দিয়েছি। বিশ্বনাথ এইবার কালী কলেজ থেকে  
বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে—উত্তীর্ণ নিশ্চয়ই হবে। কলেজের ছাত্রদের  
মধ্যে সে এখন আদর্শ-স্থানীয়;—কি লেখাপড়ার, কি ধর্মভাষ্যে,  
কি রনয়নব্রতায়, কি পরোপকারে, বিশ্বনাথ বিশ্বনাথেরই দাস।

ভুবন ছেলের বিবাহের ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিত আছে।  
এইবার মা, আধাকে ঘটকালি করতে হবে;—তোরা আধাকে  
দিয়ে কি না করিয়ে নিলি, বল দেখি।”

লক্ষ্মী একটু বিমর্ষভাবে বলিল, “তা কি পারবেন প্রভু!  
অজ্ঞাতকুলশীল—”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “কি বলছ মা! অজ্ঞাতকুলশীল বলে  
ভুবন আপত্তি করবে?”

লক্ষ্মী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “তিনি আপত্তি না/করতে পারেন—  
তাঁর গুরু-মাজা। কিন্তু সমাজ—”

সন্ন্যাসী গর্জিয়া উঠিলেন,—“কি বলছ মা, সমাজ? কোন্  
সমাজ? তোমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজ? সে সমাজ মরতে  
বসেছে। দেখতে পাচ্ছ না মা, সে সমাজ এখন শ্মশান-শব্দ্যার।  
যে সমাজে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যক্তিচারের শ্রোত অবাধে প্রবাহিত  
হচ্ছে; যে সমাজে ধর্ম প্রাণ বীরের অভাব হয়ে পড়েছে; যে সমাজে  
কপটতা ধর্মের আসীন কলুষিত করেছে,—সেই অধঃপতিত, সুহ্মা-  
শুখ সমাজের কথা বলছ? সে সমাজকে ভয় করতে হবে না—  
তার অস্তিত্ব শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। তুমি জান না মা, তুমি দেখতে  
পাও নাই; আমি দেখতে পাচ্ছি—নব ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হচ্ছে।  
সে সমাজে সুস্থ, সবল, প্রাণবান্, ধর্ম প্রাণ, কঠোর কর্তব্য-পরায়ণ  
বীরের আবির্ভাব হয়েছে। তোমার সে জীর্ণ, পুতিগন্ধময় সমাজ  
ধর্মের ধীরে অস্তিত্ব হচ্চে; আর তার স্থানে এই নব-বলদৃশ্য,  
সদাচার-সম্পন্ন নূতন ব্রাহ্মণ-সমাজের অভ্যুত্থান হচ্ছে। এই

সমাজই ভবিষ্যতে—অদূর ভবিষ্যতে পুণ্যভূমি ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তার সূচনা হয়েছে,—তার বিকর-হৃদয়কে বেজে উঠেছে; প্রাচ্য-প্রতীচ্যে তার সাজা পপে গিয়েছে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি আমি সেই সমাজ-গঠনে নিযুক্ত করেছি,—তোমাদের নাতৃশক্তি সেই সমাজের ভিত্তি প্রোথিত করছে। সেই সমাজের কথা বল। হিন্দু-সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে—পুরাতন দুর্গন্ধময় আচার-অনুষ্ঠান আর চলবে না—চলছে না;—মুনিঋষি-গণের সেই সনাতন আর্ঘ্য-ধর্মের প্রতিষ্ঠা অবশুস্তাবী। এখন তাহারই জয়গান কর;—পুরাতনের কথা ভুলিয়া যাও,—নব-জীবনকে সানন্দে অভ্যর্থনা কর। সেই সমাজে তোমার ত্রায় শাক্তী সতীর কছা, তোমার ত্রায় ধর্মপরায়ণা, নির্ভাবতী, মহির্ময়ী মহিলার হ্রহিতা স্থান প্রাপ্ত হবে। ইহাই বিশ্বনাথের আদেশ! সেই আদেশই আমরা প্রতিপালন করব—আর কোন আদেশ আমরা মানি না।”

লক্ষ্মী বিনীতভাবে বলিল, “একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কি ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, “স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না; তোমার মনের কথা বুঝেছি। তুমি বলতে চাচ্ছ যে, তোমার কোনদিন বধা-শাস্ত্র বিবাহ হয় নাই; যে পাষণ্ড তোমার উপর অত্যাচার করেছিল, তাকে তুমি চিন্তে পার নাই; সুতরাং তোমার মেয়েকে কেহ বিবাহ করতে পারে না। কেমন, এই ত তোমার কথা।”

লক্ষ্মী বলিল, "বিবাহ করিতে পারে না, বা করা উচিত নয়, এ কথা আমি বলছিলাম; কিন্তু যে হিন্দু-সমাজ এখন বর্তমান, সে সমাজ কি অসমুচিত চিন্তে এ বিবাহের অনুমোদন করতে পারবে? এই আমার কথা।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি তো সে কথার উত্তর পূর্বেই দিইয়াছি। তারও বর্ষে নুতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গঠিত হইতে আরম্ভ করেছে। সে সমাজ জ্ঞান ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত;—সে সমাজ দেশাচারকে ভয় না, ভয়াবেও না। আচ্ছা, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপরাধ কি? কি অপরাধে সমাজ তোমাকে ঠেলে কেলেতে পারে? তুমি কি অসতী?"

সরস্বতী সজ্জিয়া উঠিলেন, "অসতী! লক্ষ্মী আমার গভী-শিরোমণি। লক্ষ্মী রমণীর আদর্শ। তার গর্ভে যে ভ্রমগ্রহণ করেছে, তার পিতৃপরিচয়ের কোন দরকার নাই—মাতৃ-পরিচয়ে, মাতৃ-মহিমায় আমার ঈশানী ইচ্ছাশী অপেক্ষাও উচ্চ পদের দাবী করতে পারে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঠিক বলেছ সরস্বতী! মা লক্ষ্মী, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তোমার ঈশানীকে আমি যার হাতে সর্পণ করব, সে এই অমূল্য রত্নের আদর বুঝতে পারবে। তার কাছে ও-সব পরিচয় অতি তুচ্ছ বলে গণ্য হবে।"

লক্ষ্মী বলিল, "তা হ'লে আমাকে এখন কি করতে বলেন?"

সরস্বতী সে কথার উত্তরে বলিলেন, "আর কি করতে বলবেন,

ছাদশ বৎসর উদ্‌ঘাপন হ'ল। এখন মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখে  
সংসার কর ;—আমি বিদায় গ্রহণ করি।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তা আর হয় হয় না সরস্বতী ! তোমাদের  
হৃদয়কেই আমি ছেড়ে দেব ; ঘর-সংসার করা অপেক্ষাও অনেক  
উচ্চ কাজ তোমাদের করতে হবে। সে আর একদিন বলব ;  
এখন আমাকে একবার কুবনের বাড়ী যেতে হবে।” এই  
বলিয়াই সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন ।



সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবীর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ; ধনে-মানে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তিনি কবীর সম্রাস্ত বাঙ্গালী-সমাজের অগ্রতম। পশ্চিম-দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কবীরে তিনপুরুষ বাস করিলেও দেশের সহিত তিনি সখ্য লোপ করেন নাই। দেশে তাঁহার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন সকলেই আছেন ; বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হইলে তিনি দেশে যান ; এবং সেখানেই সমস্ত কাৰ্য্য করেন। তাঁহার পিতামহ কবীর-মঞ্চলে জমিদারী ক্রম করিয়াছিলেন ; সেই উপলক্ষেই তাঁহার কবীরবাসী।

ভুবন বাবু সন্ন্যাসী মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি করেন। তাঁহারই নিকট সন্ন্যাসী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী মহাশয়ও ভুবন বাবুকে বড়ই স্নেহ করেন। সন্ন্যাসীর উপদেশ ও আদেশ ব্যতীত তিনি কোন কাজই করেন না।

ভুবন বাবুর একমাত্র পুত্র যখন বালক, তখন হইতেই সন্ন্যাসী মহাশয় তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহার পর সে যখন ইংরাজী স্কুলে বিদ্যারম্ভ করিল, তখন সন্ন্যাসী মহাশয়ই তাহার অগ্র উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেও

সর্বদা বিশ্বনাথের খবর লইতেন। বিগত ছয় বৎসর তিনি নিশ্চই বিশ্বনাথের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষাবিধানের অধীনে বিশ্বনাথ একদিকে যেমন পরীক্ষার বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতেও কৃতিত্ব লাভ করিতে লাগিল; সনাতন হিন্দুধর্মের উপর তাহার তেমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময় সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথকে ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে লইয়া যাইতেন এবং ঈশানীর সহিত নানা বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত করিতেন। উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ বাহাতে স্থাপিত হয়, পরস্পর পরস্পরের অধীনে অকুরাগী হয়, সে বিষয়েও তিনি সচেতন ছিলেন।

ভুবন বাবু একমাত্র পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব গুরুদেবের নিকট একদিন উপস্থিত করার, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, "ভুবন, বাহাকে আমি মাহুষ করিতেছি, তাহার সকল ভার আমার উপর। তুমি ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক; যখন কালে সে বাবু হইবে; এখন তাহার শিক্ষালাভের বাধা তদ্বাইও না।"

শুক্রতরু ভুবন বাবু ও তাঁহার সহধর্মিণী এই কথাই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হইলেন; শুক্র বধন ভার গ্রহণ করিলেন; তখন আর কথা কি?

পূর্ব-অধ্যায়-বর্ণিত কথোপকথনের দিনই অপর-সময়ে সন্ন্যাসী ভুবন বাবুর বাড়ীতে বাইরা তাঁহাকে

ডাকিয়া বলিলেন, “ভুবন, বিশ্বনাথের বিবাহ দিবস সময় উপস্থিত  
হইরাছে। আমি তাহাকে সচরাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে  
চাই।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “সে ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছেন,  
আমরা তাই নিশ্চিত আছি। আপনি যখন বিবাহ দিবস অল্প  
মতি দিতেছেন, তখন আমরা ভাল মেয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই!  
আপনি দেখিরা-শুনিয়া মত প্রকাশ করিলেই যত শীঘ্র হয় গুণ-  
কার্য সম্পন্ন করিব।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “সে অনুসন্ধানও তোমাকে করিতে হইবে  
না, আমি তাহাও করিয়াছি। এখন তুমি ও তোমার সহধর্মিণী  
একবার বেহেট্টা বেথ, ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “দেখাশুনা বা পরিচয় যখন আপনি  
করিয়াছেন, আপনি যদি উপযুক্ত মনে করিয়া থাকেন, তাহা  
হইলেই হইল। আপনার আদেশই যৎসমস্ত।”

এই সময় ভুবন বাবুর গৃহিণীও সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং  
শুরুদেবকে প্রশাসন করিতেই তিনি বলিলেন, “মা, বিশ্বনাথের  
বিবাহের পাঞ্জী স্থির করিয়াছি; তোমাদের একবার দেখিতে  
যাইতে হইবে।”

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “আপনি যখন দেখিয়াছেন, তখন  
আমি আমরা কি দেখিব?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তবুও দেখা কর্তব্য।”

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “কাহার কত্যা?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “আমারই আত্মীয়া।”

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “আপনার আত্মীয়া! তাঁহা হইলে  
ঈশানী নামে যে মেয়েটির প্রশংসা, বিশ্বনাথ সর্বদা করে তাহারই  
বখা বলিতেছেন। সেই ত আপনার আত্মীয়া।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, হাঁ, সেই মেয়েই বটে। বিশ্বনাথের সহিত  
তাহার বিবাহ দিব বলিয়াই আমি তাহাকে তোমার পুত্রবধু  
হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছি।”

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “বিশ্বনাথের কাছে আমি মেয়েটির  
প্রশংসা খুব শুনেছি। সে ত শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর কন্যা।  
সরস্বতী দেবী যে আমার বাগের বাড়ীর গ্রামের চাটুষ্যদের পুত্র-  
বধু। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার কাশীতে এসে বাস করছিলেন।  
তাঁর মত মায়ের মেয়ে যে ভাল হবে, তাঁর আর আশ্চর্য্য কি।  
চাটুষ্যেরা খুব বড় ধর; বিবয়-সম্পত্তিও অনেক।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “হা, এখানে তুমি একটু ভুল করলে। সর-  
স্বতী ঈশানীর মা নয়; মেয়েটিকে লালন-পালন করবার ভার  
আমিই সরস্বতীর উপর দিয়েছিলাম; সকলেই জানে, এমন কি  
ঈশানীও জানে, সে সরস্বতীর মেয়ে।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “আমিও ঐ রকমই শুনেছিলাম।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “না ভুবন, ঈশানী সরস্বতীর মেয়ে নয়,  
লক্ষ্মীর মেয়ে।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “বলেন কি শুভ! লক্ষ্মী দেবীর মেয়ে  
এ কথা ত জানতাম ন লক্ষ্মী দেবী ত দাম্বনন—সত্যসত্যই

দেবী ; তাঁর নাম যে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে পড়েছে । যেখানে ছুঃখ  
কষ্ট, যেখানে আপদ বিপদ, সেখানেই লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী এই আমাদের  
বাড়ীতেই কতদিন এসেছেন ! গোকৈ বলে, তিনি শাপভ্রষ্টা ।  
বিশেষ তিনি যখন আপনার শিষ্যা, তখন এ রকম যে হবে, তার  
আর আশ্চর্য্য কি ! প্রভু, আপনি যে কি খেলাই খেলেছেন !”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “ঐ মেয়েটা পাছে লক্ষ্মীর ঝগ-ধর্ম্মের অন্ত-  
রায় হয় সেইজন্য মেয়েটা জন্মাবার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীকে  
আমার আশ্রমে নিয়ে যাই । তখন সে বড়ই অমৃস্থ ; আর সেই  
সময়ই সরস্বতীর উপর মেয়েটার ভার দিই ; নইলে ঐ মেয়ের  
মায়ার বন্ধ হলে, হয় ত লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী দেবী করতে পারতাম না।”

ভুবন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, “এ যে আমাদের পরম সৌভাগ্য ।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “ভুবন, মা লক্ষ্মীকে তোমরা জান, আদিও  
তাকে হাতে গড়ে তুলেছি ; কিন্তু ঈশানীর পিতার কথা, তাহার  
পরিচয় তোমরা জান না । সে ইতিহাস শোন ।”

এই বলিয়া সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর জীবনের আদ্যস্ত ঘটনা ধীরে-ধীরে  
বলিয়া যাইতে লাগিলেন । অবশেষে বলিলেন, “শুনিলে, তোমার  
লক্ষ্মীর জীবন-কথা । লক্ষ্মী কাহারও বিবাহিতা পত্নী নহে ।  
অসহায় কুমারী হর্ষকৃতের কবলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল ।  
তাহার ফলেই এই কল্পা । সেই আক্রমণের মুহূর্ত্তের পর হই-  
তেই লক্ষ্মী বিধবা । বিবাহ না হউক, কণকালের জন্য অজ্ঞান  
অবস্থায় সে একচনের কান-পত্নী হইয়াছিল ; তাহার পরক্ষণ হই-  
তেই সেই হর্ষকৃত লক্ষ্মীর পক্ষে মৃত । এই অজ্ঞাত-জনক কল্পার

সহিত, প্রকৃত ব্রহ্মভেজগর্ভিতা দেবীর গর্ভদাতা কুমারীর সহিত  
 আমি তোমাদের বিশ্বনাথের বিবাহ দিতে প্রীত হইয়াছি। ভূবন,  
 মনে করিয়া দেখ, তোমার পুত্রের "নামকরণের কথা। আমিই  
 তোমার বিশ্বনাথ নামকরণ করিয়াছিলাম। আজ সেই নাম সার্থক  
 করিতে যাইতেছি। যে বিশ্বনাথ, সে জৈশানীকে গ্রহণ করিবে না  
 কেন? বিষ্ণুনাথ গ্রহণ করিবে, তাহা আমি জানি; আর তোম-  
 রাও যে তোমাদের সেই পুতিগুরুময় সমাজ-শাসন না মানিয়া এই  
 প্রস্তাব গ্রহণ করিবে তাহা আমি জানি। এই আজই লক্ষ্মীকে যখন  
 এই কথা বলিলাম, তখন সে তোমাদের হইয়াই সমাজের কথা  
 ভুলিয়াছিল। আমি তাহার কথার উত্তরে যাহা বলিয়াছি, সে কথা  
 কতদিন, কত প্রকারে তোমাকে বলিয়াছি ভূবন! যে সমাজ মিথ্যা,  
 কপটতা, বাতিলচারের প্রশ্রয় প্রদান করে, যে সমাজ পাপ গোপন  
 করিবার জন্য কত গর্হিত উপায় অবলম্বন করে, যে সমাজের কলঙ্ক-  
 কালিমায় বিশ্বনাথের এই পবিত্র কাশীধাম প্রতিদিন মসীময় হই-  
 তেছে, যে সমাজ মান-সম্মত রক্ষার জন্য লক্ষ্মীকে ভ্রু হত্যা করাই-  
 বার ব্যবস্থা করিয়াছিল, সেই সমাজের মুখের দিকে আর চাহিতে  
 পারিবে না;—সে সমাজ যাইতে বসিয়াছে। তার স্থানে আঁকিয়া  
 পড়িয়াছে আর এক ব্রাহ্মণ-সমাজ;—অস্মিমা পড়িয়াছে ভূবন!  
 তোমরা সেই সমাজের অগ্রণী। তোমরা মিথ্যা, কপট আচরণ  
 করিতে পারিবে না। প্রকাশ্যভাবে বল যে, লক্ষ্মীর কথার সহিত  
 তোমার পুত্রের বিবাহ দিবে, কোন কথা গোপন করিতে পারিবে  
 না। বাহারা এখনও পুতিগুরুময় সমাজের শব বুকে করিয়া, চক্

সুনিরা পড়িয়া আছে, তাহারা তোমার প্রতিকূলতা করিবে; কিন্তু  
 এই কাশীধামে বাহারী মহাপণ্ডিত, বাহারী ছন্দরবান, বাহারী  
 ভবিষ্যৎ পবিত্র সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাকামী, তাহারা সানন্দে  
 তোমাকে অভিবাদন করিবেন। আমি অনেকের সহিত তর্ক  
 করিয়াছি, বাদান্তবাদ করিয়াছি। বাহারী প্রকৃত মানুষ, তাহারা  
 আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বাহারী সুধু পুথি লইয়াই  
 আছেন, আচারের গভীর মধ্যেই অন্ধভাবে বিরিতেছেন, চক্ষু  
 মেলিয়া দেখিতেছেন না, তাহারা বলিয়াছেন তাই শু, যে কি  
 করিয়া হইতে পারে। তাহাদের দেখাইতে হইবে, এই করিয়া  
 হইতে পারে,—এই দেখ হইল। মনে করিও না ভুবন, মনে করিও  
 না মা, তোমরা জাতিচ্যুত হইবে,—তোমরা একঘরে হইবে। সে  
 দিন আর নাই মা! এক দল তোমানিগের সহিত হয় ত কিছুদিনের  
 জন্য আহার বন্ধ করিবেন, হয় ত তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের  
 মধ্যে কেহ-কেহ তোমাদের সহিত যোগদান করিতে কয়েকদিন  
 কুণ্ঠিত হইবেন; কিন্তু দেখিও, সত্যনিষ্ঠ, নববলদৃপ্ত, সুস্থ, সকল  
ব্রাহ্মণ সমাজ তোমার সহিত যোগদান করিবে। তাহারা সংখ্যায়  
কুক্ষ নহে—তাহারাই ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা, তাহারাই  
পবিত্র আর্ষ্য-ব্রাহ্মণ-সমাজের বীর। কেমন ভুবন, কেমন মা, এ  
 কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবে? দেখ, তোমরা হয় ত মনে করিতে  
 পসর, এ কার্য অশাস্ত্রীয়। বর্তমানে আমাদের দেশ শাস্ত্রের মিথ্যা  
সংস্করণ দ্বারা শাসিত হইতেছে; আমাদের সমাজ এখন শাস্ত্রকে  
দূরে কেনিয়া দিয়া দেশাচারের কঠিন নিগড় পায়ে পরিরাছে।

এ সমাজের কথা বলিব না ; কিন্তু সনাতন আৰ্য্য-সমাজ, আমাদের পূজনীয় মুনিঋষিগণের সমাজ এ সম্বন্ধে, ঠিক এই ঈশানীরই অহুসরণ একটা ঘটনা সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, শুনিবে ? ভুবন, তুমি কি মহাভারতে সত্যকাম-জ্বালার কথা পড় নাই ? মা, শোন সেই উপাখ্যান। জ্বালার পুত্র—একমাত্র সন্তান সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের আশায় শিক্ষিত করিবার জন্ত গিয়াছিল। ঋষি তাহার নাম-দাম, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সত্যকাম বলিল 'ঠাকুর, আর কোন পরিচয় জানি না, এইমাত্র জানি, আমি আমার মা জ্বালার পুত্র।' এই কথা শুনিয়া গৌতম ঋষি বলিলেন 'বৎস, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বতীত অগ্র কাহাবেও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি না। তুমি তোমার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিও আইস, তোমার পিতার নাম-গোত্র কি ?' সত্যকাম তখন মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সন্ত কথ্য বলিল। এই কথা শুনিয়া জ্বালা জন্মান-বদনে অসহুচিত-চিত্তে বলিলেন 'বাছা, ঋষিপ্রবরকে বলিও, আমি যৌবনকালে বড় মরিয়া ছিলাম। সেই সময়ে অনেকের উপাসনা করিয়াছি ; স্ততরাং কে তোমার পিতা ; তাহা ত আমি বলিতে পারিব না। সত্যকাম তখন গৌতম ঋষির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'পুত্র, মা বলিলেন, তিনি যৌবনে অনেকের উপাসনা করিয়াছেন ; স্ততরাং আমার পিতা কে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না।' এই কথা শুনিয়া গৌতম কি বলিয়াছেন, তাহা শুনিবে কি ? সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিমা সে কথা বলিব না ; তোমাদেরই একজন



কবি গৌতম ঋষির সেই অমৃতময়ী বাণীর যে প্রতিধ্বনি  
করিয়াছেন তাহাই তৈমিদিগকে বলি—

“উষ্ঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন  
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন  
কহিলেন,—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত  
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত!”

বুঝিলে কি ভুবন, বুঝিলে কি মা ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?  
জবালার পেছায় অনেকের পরিচর্যা কবিগাহিল; সে স্পষ্ট  
বলিয়াছিল—

“কল্প পরিচর্যা করি পেয়েছিলু তোরে,  
জন্মেছিলু ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—  
গোত্র তব নাহি জানি।”

অসঙ্কচিত চিত্তে নিজের স্বেচ্ছাকৃত পাপের কণা প্রকাশ করি  
বার মনুষ্য জবালার ছিল; তাই গৌতম ঋষি সেই সত্যনিষ্ঠাবতী  
মুণ্ডের পুত্রকে অনার্যাসে দ্বিজোত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন,—  
তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিলেন। এখন ভুবন, আমার লক্ষীর  
কণ্ঠে তাব দেখি। সে কাহাকেও আত্মদান করে নাই। অস-  
হাঙ্গা কুমারীকে গভীর অন্ধকার রজনীতে হৃৎকৃতেরা বলপ্রকাশে  
বহিষ্কার করিল; তাহার ধর্ম্যনষ্ট করিল। তখন সে অজ্ঞান—  
তখন তাহার বাধা দিবার শক্তি ছিল না। অত্যাচারের

কলে তাহার গর্ভসকার হইল। তাহার আত্মীয়-বন্ধন ভ্রূণহতা  
 করিতে বলিল। সে ওদা করিল না,—সে কায়মনোবাক্যে  
 বিশ্বাস করিতেছিল, সে অসতী নহে। এ ছি তাহার মিথ্যা  
 ধারণা ভ্রূণ? তারপর এই পাপের কার্য্য অতিক্রম করি-  
 বার জন্য লক্ষ্মী চির-নির্ধারসন-দণ্ড গ্রহণ করিল,—সকলের  
 আশ্রয় ত্যাগ করিল—ভিখারিণী হইবার সঙ্কল্প করিল। তাহার  
 পর ঘাঘা হইয়াছে সে সবই তুমি জান; সকলই তুমি শুনিয়াছ।  
 এখন তুমিই বল ভ্রূণ, তুমিই বল মা, আমার জ্ঞানীকে কি তুমি  
 ব্রহ্মী-কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে একটুও বিধা করিতে পার?   
 সত্যকামকে গোতম ঋষি বিজ্ঞাতম বলিয়াছিলেন;—কেন?  
 তাহার মাতা সত্যগবিনী—সত্যকাম সত্যকুল-জাত। আমি  
 বলিতেছি, দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, সে তুমি আমার জ্ঞানী  
 সহস্রগুণে বিজ্ঞাতম! লক্ষ্মীর কন্যাকে এ নামে অভিহিত করিতে  
 কেহই সঙ্কুচিত হইতে পারে না। এ সব কথা না ভাবিয়া আমি  
 আমার পরম স্নেহাস্পদ বিশ্বনাথকে জ্ঞানীর সঙ্গে উদ্ধার-বন্দনে  
 বদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতাম না। ইহাই প্রকৃত হিন্দু—ইহাই  
 সনাতন হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব! এই মহত্ত্বের গৌরব রক্ষা করিতে  
 হইবে। সেই জন্যই আমার এই প্রয়াস! এখন বল মা, এই  
 কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে? সর্ব্বাশংকরণে আমার এই  
 প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিবে? ভুলিয়া যাও, অশ্রম  
 তোমাদের শুরু,—ভুলিয়া যাও, আমি তোমাদের এ আদেশ  
 করিতেছি। মনুষ্যত্বের গৌরবের আদানে উপবিশ্ট হইয়া, সনা-

তন আৰ্হা ধৰ্ম্মের মহিমার দিকে চাহিয়া বল তোমা এ কাৰ্য্য  
করিতে পারিবে কি না ?”

ভুবন ও তাঁহার সহধৰ্ম্মিণী সন্ন্যাসীর পদধূপি গ্রহণ করিয়া  
বলিলেন, “হাঁ পারিব, নতুবা আপনার শিষ্য হইবার আমবা  
অযোগ্য।”

এই সময় রমেশ সেখানে প্রবেশ করিল। তাঁকে দেখিয়া  
ভুবন বাবু বলিলেন, “এই যে রমেশ ! এস এস।”

রমেশ সঙ্গাঙ্গ মুখে বলিল “আমি খালি হাতে আসিনি, কুটুৰ-  
বাড়ীতে কি অমনি আসে, তত্ত্ব এনেছি।”

ভুবন বাবু বলিলেন, “কৈ তোনার তত্ত্ব রমেশ !”

রমেশ বলিল, “নীচে আছে। রমেশ কি আর এখন  
হেঁটে চলে, গাড়ী করে এসেছে। শুকুম হয় ত তত্ত্ব নিয়ে  
আদি।”

এই বক্তব্য আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই রমেশ নীচে  
চলিয়া গেল এবং একটু পরেই পুনরায় উপস্থিত হইল—সঙ্গে  
সরস্বতী, বন্দী ও ঈশানী।

রমেশ বলিল, “এই নিন আপনাদের তত্ত্ব। আজ বার বছর  
ধরে বুড়ো এই তত্ত্ব গুছিয়ে আসুছে ; আজ কুটুৰবাড়ী পৌছে দিবে  
রমেশের ছুটি। ভরে বেটাগা, কৈ তে, শাং বাজা।”

ভুবন বাবুর সহধৰ্ম্মিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঈশানীকে বুকের  
মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “এস এস মা, আমার ঘরের  
কল্যাণী এস ! আমার অন্নপূৰ্ণা এস মা !”

রমেশ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে, শাঁথ বাজা রে,  
শাঁথ বাজা।"

ভুবন বাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "রমেশ, তোমার  
এই আনন্দধ্বনি শাঁথের ধ্বনি অপেক্ষাও পবিত্র।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, আমার সকল আশা  
পূর্ণ হয়েছে। ঈশানী, এঁদের প্রণাম কর।"

-----

সেই দিনই সকলের সম্মুখে বিবাহের দিন ~~কি~~ হইয়া গেল  
ভুবন বাবু তখনই ঈশানীকে আশীর্বাদ করিলেন। বিশ্বনাথকে  
আশীর্বাদ করিবার সময় কথা উঠিল, কে আশীর্বাদ করিবে।  
সম্মানী বলিলেন, “মা লক্ষ্মী, তুমিই বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ  
কর।”

লক্ষ্মী বলিল, “আমি! আমি কে? আমি ত কেউ নই  
প্রভু! আমি মেরেকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম; তার পুর থেকে  
ত ঈশানীর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। আমি নিতান্ত  
অপরিচিতার মত কখন কোন দিন ওকে দেখতে গিয়েছি নাজ।  
আজকার পূর্বে পর্যন্ত ঈশানীই জানতে পারে নাই যে, আমি  
তার গর্ভধারিনী। যে তাকে মানুষ করেছে, যে তার মায়ের  
কাজ করেছে, সেই আশীর্বাদ করবে; আমি শুধু দাঁড়িয়ে  
দেখব।”

সরস্বতী বলিলেন, “ব্যাপার হোল ভাল। মেরের বাপ  
পাঞ্জা গেল না, মা-ও দেখছি ঝেড়ে ফেলতে চান। ত' বেশ  
কথা। আমাদের কাউকেই আশীর্বাদ করে কাজ নেই; অ

বলি কি রমেশ দাদা বিশ্বনাথকে আশীর্বাদ করবে; রমেশ দাদাই  
ঐ বিবাহের কতাকর্তা।”

রমেশ বলিল, “ঠাকুর মশাই, শুনলেন এদের কথা। আমি  
রমেশ জ্ঞানী পৃথিবীর কারো আত্মীয় নই; কারণ সংসারের  
কোন ধাতু ধারি নে। এই লক্ষ্মী সরস্বতী ছইটোতে মিলে আমাকে  
এই বারটা বছর ভূতের ব্যাগার খাটিয়ে নিল। তার পর এখন  
বলে কি না, আশীর্বাদ কর। তার পর বলে বসবে, এদের স্ব-  
লংকার বেঁধে দেও না, দিদিমণিরা রমেশ জানা আর ফাঁদে  
পা দিচ্ছেন না। এই বারটা বছর, বুঝলেন ভুবন বাবু, এই  
বারটা বছর ঐ ক্ষুদ্রে মেরেটা আমার সব ওলটপালট করে  
মিরেছে। দিদি লক্ষ্মী ত চলেই গেলেন; ধরা পড়লেন ঐ সর-  
স্বতী ঠাকুরপুত্র আর ধরা পড়লেন এই রমেশ জ্ঞানী! ওঁর ধর্মকর্ম  
উড়ে গেল, জপ-তপ চলে গেল—সুধু ঈশ্বরী, আর ঈশানী।  
আর আমার কথা কি বলব; আমি এই ক্ষুদ্রেতে পঞ্চাশ বছর বুক  
ফুলিয়ে বেড়িয়েছি; বা খুসী তাকি করেছি; কোন ভাবনা-চিন্তে  
ছিল না। কালীশ্বর বললেন, রও রমেশ জানা, তোমার মতা  
দেখাচ্ছি। দেখুন না ঠাকুর মশাই, কোথাকার বাজাল দেশের  
এক মেরে এসে পড়বি না পড়বি এই রমেশ জানার কাঁধের  
উপর। কেন রে বাপু, কানীতে কি আর মাহুৎ ছিল না?  
তার পর দেখুন, এই বারটা বছর রমেশ জানা আর আগেকার  
সে রমেশ ছিল না। এমন বাধনেও বাধতে হয় ঠাকুর মশাই!  
এ সমস্ত আগনারই কাজ। আমি স্পষ্ট বলছি দিদি লক্ষ্মী-

সরস্বতী, তোমাদের মাঝার আমি আর ভুলছি। আমি তোমাদের  
আশীর্ষাদের মধ্যে নেই।

ঈশানী এতক্ষণ সরস্বতীর পাঁখে বসিয়া ছিল; এই সময় সে  
হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া রমেশের কোলের কাছে বসিল।

রমেশ অস্বস্তি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওরে সর্বনাশী, অমন  
করে তুই আমার জড়িয়ে ধরিস্নে। দেখুন দেখি ঠাকুর মশাই,  
আমি চাচ্ছি ওকে বেড়ে ফেলতে, আর ও কিনা আমারই কোলের  
কাছে এসে বসবে—আমাকে শত বীধনে জড়াবে। ওরে রাকুলী,  
তুই কি রমেশকে পালাতে দিবি নে। দেখছেন ঠাকুরমশাই,  
মেয়েটার হাসি! ওই হাসিতেই ত আমার সব ভুলিয়ে দেয়।  
আজ বার বছর আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। হাস, হাস, মা  
আমার, খুব হাস! আমি ঐ হাসি দেখতে-দেখতেই বেন মরি।  
হুক, বেশ বুঝলাম রমেশ এখন তার সব ঐ মেয়েটার কাছে  
বিকিয়ে দিয়েছে। আর কোন কথা বলব না। দাও না গো,  
কি দিবে বাবা বিশ্বনাথকে আশীর্ষাদ করতে হবে, দাও। দিবি  
লক্ষ্মী, সরস্বতী, তোমরা পঞ্চপেয়েছ; তোমরা তোমাদের পুণে  
যাও।" আমার পথ এই ঈশানী-বিশ্বনাথ।"

সন্ধ্যায় তখন একটা বেদের পাতা রমেশের হাতে দিয়ে বলি-  
লেন, "রমেশ, বাবা বিশ্বনাথ বেদের পাতাতেই সম্বল। তুমি তাই  
দিয়েই আশীর্ষাদ কর।"

রমেশ তখন সেই বেদের পাতা দিয়া বিশ্বনাথকে আশীর্ষাদ

করিয়া উঠেঃখরে বলিয়া উঠিল, "এর বিশ্বনাথজিকি জর! মা  
ঈশানী-বিশ্বনাথকি জর!"

সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য গাত্ৰোত্থান করিলে সন্ন্যাসী  
বলিলেন, "তোমরা এখন হইতেই বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত  
হও। আমি আশ্রমে বাই, বিবাহের দিন বধাসময়ে উপস্থিত  
হব।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আপনি কি এখন এক  
বার আমাদের সঙ্গে বেতে পারবেন না?" লক্ষ্মীর কথার  
ম্মিন্তি-পূর্ণ।

সন্ন্যাসী লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; তাহার মুখ  
বড়ই বিষন্ন, চিন্তাক্রান্ত। তিনি বলিলেন, "কেন মা! তোমার  
কোন প্রয়োজন আছে? তোমার মুখখানি বড়ই মগ্ন  
দেখাচ্ছে।"

লক্ষ্মী বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাদের সঙ্গে আসুন।"

সন্ন্যাসী এই কাতর অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাদের অনুগমন  
করিলেন।

বাসার পৌছিবার পর লক্ষ্মী বলিল, "প্রভু, আপনাকে বড়ই  
কষ্ট দিলাম। কিন্তু উপায় নাই। আপনি এই দ্বাদশ বৎসর  
আমাকে বাহা শিখাইয়াছেন আজ এক মুহূর্তে সে সব ভুলিয়া  
বাইতে বসিলাম প্রভু!" এই বলিয়া লক্ষ্মী নীরব হইল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, তোমার কথা শুনি আমি ব্যথিত  
পারিলামনা।"



লক্ষী বলিল, "প্রভু, এই দ্বাদশ বৎসর আমি সমস্তই ভুলিয়া  
 ছিলাম। ঈশানীকে মাথা-মধ্যে দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু আপ-  
 নার রূপায়, আপনীর শিক্ষার গুণে, আপনি যে সকল কাছের  
 ভার আমার উপর দিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব ও মহত্ব আমার  
 গর্ভজাতা সন্তানও আমাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আমি  
 মনে করিয়াছিলাম, আমি মায়ামোহে জর করিয়াছি; দেশের  
 সেবা বশীত আমার জীবনে আর কোন কাজ নাই। কিন্তু প্রভু,  
 আগ্র আমার সকল গর্ব চূর্ণ হইয়াছে। ভুবন বাবুর বাড়ীতে  
 বসিয়া যখন আমি ঈশানীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐশাসীনা দেখাটকা কথা  
 বলিলাম, তাহার পর মুহূর্ত্তেই আমার বৃকের মধ্যে কেমন  
 করিয়া উঠিল। আমি তখন ঈশানীর দিকে চাহিলাম। প্রভু,  
 এমন ভাবে তুমিই দিকে আমি কোন দিন চাহি নাই। সেই  
 মুহূর্ত্তেই আমার মনে হইল, আমি ঈশানীর জননী;—আমি  
 তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সে যে আমারই বৃক চেরা  
 ধন। আমার বৃকের ভিতর তখন কেমন করিয়া উঠিল। যে  
 মাতৃ হইতে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া আমি এককাল  
 কাটাইয়াছি, তাহা নিমিষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা  
 হইতে লাগিল, ঈশানীকে আমি বৃকে চাপিয়া ধরি,—তারদ্বরে বলি-  
 —ওরে তুই আমার সন্তান! তুই আমার! যে স্নেহ, মনতাকে  
 আপনি বিশ্বময় সঙ্গসারিত করিবার জন্য এত শিক্ষা দিলেন তাহা  
 যে আমার থাকে না। এ কি করিলেন প্রভু!"

সন্ন্যাসী গভীরভাবে লক্ষীর কথা শুনিতেছিলেন। লক্ষী যখন

নীরব হইল, তখন বলিলেন, “মা লক্ষ্মী, আজ আমার পরাজয় আমি মানব-চিত্তের বহুস্ত্র এতকাল বৃত্তিতে পারি নাছি—মাতৃ-  
 ধের মহত্ব জয়সম করিতে পারি নাছি, আজ বৃষ্টিগর্ভ। কেন  
 তোমরা বিশ্বজননী!

কিন্তু চূপ করিয়া থাকিরা সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা লক্ষ্মী,  
 তোমার জন্য আমি যে পথ নির্দেশ করিয়াছি, সেই শ্রেষ্ঠ পথ;  
 —তোমাকে সেই পথেই যাইতে হইবে। কিন্তু বড় ঞেড়াতাড়ি  
 তোমাকে অগ্রসর করিয়াছিলাম। ঈশানীর মধ্য দিয়াই তোমাকে  
 জগতে সম্প্রসারিত করা কর্তব্য ছিল। বেশ, তাহাই হইবে।  
 তুমি এখানেই থাক লক্ষ্মী! ঈশানী আজ হইতে তোমার কন্যা।  
 তাহার পর যাহা করিতে হয়, পরে হইবে। মা জগদম্বা তোমার  
 খেলার আর একটা দিক আজ দেখিলাম—শিখিলাম।” তাহার  
 পর সরস্বতী ও রমেশকে বলিলেন, “দেখ সরস্বতী, ঈশানীর বিবা-  
 হের যথাসাধ্য আয়োজন কর। তোমার যাহা কিছু অর্থ আছে,  
 এই বিবাহে সমস্ত ব্যয় করিয়া তোমাকে একেবারে রপদ্বিক-শূন্য  
 হইতে হইবে। রমেশ, তোমার উপর সমস্ত আয়োজনের ভার  
 দিলাম। ঈশানীর বিবাহ হইয়া গেলে তোমাদেহ সৰ্বদে যাহা  
 কর্তব্য, তাহা আমি করিব; তোমরা সে চিন্তা করিও না।” এই  
 বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতে উদ্ভত হইলেন। তখন লক্ষ্মী বলিল,  
 “প্রভু, আর একটা কথা।”

সন্ন্যাসী হানিয়া বলিলেন “কি কথা মা। তোমার কার্কা  
 হরেকৃষ্ণের সন্ধান লইবার কথা। তাহাকে আনিবার জন্যই

























## ঈশানী

“বড় বো! ও বড় বো!”

রাত্রি প্রায় বারটা। গ্রাম নিশুন্ধ। এত রাত্রে গ্রামের লোক সকলেই শিড্রামুগ্ন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকিতেছেন,—“বড় বো! ও বড় বো!”

সদী শীতল মাঝির হাতে একটা ক্যান্‌বিশের ব্যাগ। সে একটু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, “বড় কর্তা, ওঠেন; ছোট কর্তা ডাকতে চেন যে। এমন ঘুমও ত দেখি নাই। ও বড় কর্তা!”

• “কাকা না কি?”

“হ্যাঁ মা, উঠে ছরার খোল।”

তাড়াতাড়ি একটা সতর বছরের মেয়ে ছরার খুলিয়া বাহির হইল, “কাকা, এত রাত্রে এলে! আমরা মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি কাজ আর এলে না। ও মা, ওঠো, কাকা এসেছেন যে!”

মা উঠিবার আগেই মেয়েটির পিতা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গলা শুনিতে পাওয়া গেল; “হরি এলে! হর্গা

চূর্ণান্তি-নাশিনী মা !” তাহার পরই বড় কর্তা খড়ম পায়ে বাহির হইয়া বলিলেন, “এত রাত হোল যে লক্ষ্মী, তোমার মাকে ডেকে দেও। গিন্নীর কা’ল থেকে জ্বর হয়েছে। এই একটু আগেই তোমার কথা বলছিলেন। দুদিনের মধ্যে কিরে আন্বার কথা, পাঁচ দিন হয়ে গেল। উনি ত ভেবেই অস্থির।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “আরও তিন চার বারগা ঘুরে এলাম। কোথাও কোন সুবিধা করতে পারলাম না।”

“সে কথা এখন থাক, কাল সকালে শুনবো। লক্ষ্মী, বৌমাকে ডেকে তোলা। তাড়াতাড়ি যা হর রান্না চড়িয়ে দিতে হবে ত! শীতল, বোস্ বাবা! এখানেই ছুটো প্রসাদ পেয়ে যা।”

শীতল বলিল, “বড় কর্তা, এত রাতে আর পেনাদ পেয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যে বেলা আমরা বাউসমারীর বাজার থেকে চিড়ে মুড়কী নিয়ে রাতের কাজ শেষ করে এসেছি।”

বড় গিন্নী তখন বাহিরে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “শোন কথা, ছুটো চিড়ে মুড়কী খেয়েই রাত কাটাতে হবে না কি? বোস্ শীতল, দেখতে দেখতে মাছের ঝোল ভাত হয়ে বাবে। আজ তিন দিন পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। কর্তা হুখুই রাগ করে বলেন, বোসে-বোসে কাজ নেই, অকারণ কষ্ট করতে কেন যাওয়া! যা ত মা লক্ষ্মী, তিনটে মাগুর মাছ জিয়োনো আছে, তাই কুটে দে গিয়ে। ঐ ছোটবো উঠেছে। যাও ত ছোটবো! ছুটো উনম খেলে মাছের ঝোল ভাত নামিয়ে দেও। ওরে শীতল, তোর ভাইপো নগা না সন্ধ্যে গিয়াছিল। সেই ছেলেমানুষটাকে

একলা নৌকোর রেখে এলি এই নিশি-রাত্তিরে। বা বা, তাকে ডেকে নিয়ে আর! তোর নৌকোর জিনিসপত্র চুরী করবার জন্যে আর এমন সময় কেউ আসবে না। বা, শীগ্গির যা! তাকে ডেকে নিয়ে আর গে!”

শীতল বলিল, “দেখ দেখি হাংনমা! রাত হুপুর হয়ে গেল! এখন রাঁধ রে, খাও রে। রাত যে কাবার হয়ে যাবে! তাই ত ছোট কর্তারে বলিছিলাম রাত্তিরে আর বাড়ীতে উঠে কাজ নেই! নৌকোতেই শুয়ে থাক। তা ত উনি শুন্লেন না। এখন থাক বসে আর ছই ঘড়ি!”

লক্ষ্মী বলিল, “শীতল-দা, অত দেবী হবে না, ছটো মাছের ঝোল তাত, এই দেখতে দেখতে নেবে যাবে! তুমি যাও, নগেনকে নিয়ে এসো গে! আর জিনিসপত্র যা নৌকোর আছে, ছই জনে নিয়ে এসো।” এই বলিয়া লক্ষ্মী তাহা খুড়ীমার সাহায্যের অন্ত রামাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বারান্দার একঁধানি মাহুর পাতা ছিল; বড় কর্তা বসিয়া বলিলেন, “শীতল, বাবা, এক ছিলুম তামাক সাজুত। ঐ—ঐখানে সব আছে।”

হরেকৃষ্ণ মাহুরের পাশেই শানের উপর বসিয়া বলিল, “দেখ বড় বো, গেলাম ত নবীনগরের চাটুঘ্যেদের উদ্দেশে। আরে রাম, ছেলে নয় ত একেবারে আব্গারীর দোকান। আর চেহারা, বুঝলে বড় বো, একেবারে সংক্রান্তি ঠাকুর! বাবা, অত পাঁজা-ডাং-কি মাহুরের সর!



বড় বৌ হাসিরা বলিলেন, "এই দেখ, তোমার পছন্দ হোক না,  
তাই বল। পরের ছেলের নিন্দে কেন?"

হরেকৃষ্ণ বলিল, "নিন্দের কাজ করলেই নিন্দে করতে হয়।  
বাসুনের ছেলে; নবীনগরের চাটুঘোরা যেমন-তেমন ঘর নয়; নাম  
করলে লোকে চেনে। তাদের ছেলে কি না—আরে রাম রাম!"

বড় বৌ বলিলেন, "তার পর, আর কোথায় গেলে, তাই বল।  
চাটুঘোদের কথা ঐখানেই থাক।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "মজা শোন না বড় বৌ! ঐ ত ছেলে,  
ছোটো বিয়ে হয়ে গেছে। বয়স আর কত—এই বাইশ তেইশ।  
বাড়ীর কর্তা মোহিনী চাটুঘো বল্লেন, নগদ তিন হাজার টাকা  
দিতে হবে। ছেলের যে ছোটো বিয়ে আগে দিয়েছেন, সেখানেও  
না কি ঐ রকমই পেয়েছেন। শোন দেখি কথা। ইচ্ছে হোল  
খুব মঙ্গল কথা শুনিয়ে দিই। একটু—"

তঁাহাকে বাধা দিয়া বড় বৌ বলিলেন, "কিছু বল নাই ত? এ  
তোমার অভায় ঠাকুরপো! তারা ছেলের বিয়ে দেবে, তুমি ছেলে  
কিন্বে। তাদের জিনিস, তারা যা ইচ্ছে তাই দর চাইবে, তুমি  
পার কিন্বে, না পার চূপ করে চলে আসবে। ক' শোনাবে  
কেন?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আজ্ঞে কি, বল দেখি বড় বৌ! বলে  
কি না তিন হাজার টাকা! টাকা বেশ পাছের ফল, পেড়ে নিলেই  
হোল। তবুও ঐ ত ছেলে।"

বড় কর্তা এতক্ষণ শুনিতেছিলেন, কোন কথাতে হাসেন নাই।

এখন বলিলেন, "হরি, তাকে ও এ সব কথা আমি আগেই বলেছিলাম। তুমিই তখন মনে : এখন চন্দ্র-বংশের বিবাদ ত ভেঙ্গে এলে। কোলাহল-মর্যাদা-কথা-কথিতে থাকেন, পালাটা বন্ধ খুঁজতে হোলে, আমার লক্ষীর ভাগ্যে ঐ রকম বরই মিলবে, আর অত টাকাই দিতে হবে। তা বংশের উপায় কি। সেই জন্তই ত বলেছিলাম, মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমাদের অদৃষ্টে নাই। তুমিই তা বোঝ না ভাই।"

হরেকৃষ্ণ দাদার কথাই কোন উত্তর না দিয়া স্বামী, "তারপর শোন বড় বো, নবীনগর থেকে ত যাত্রা করলাম। একবার মনে হোলো, যাক, আর কোথাও যাব না, বাড়ী ফিরেই যাই। তারপর ভেবে দেখলাম, এতদূরই যখন এসেছি, তখন আর একটু দুরে শতখালির সেই ছেলেটিরও সন্ধান নিয়ে যাই। শুনেছিলাম, গোপীগঞ্জ থেকে শতখালি এই ক্রোশ দেড়েক হবে। গোপীগঞ্জের ঘাটে যেতেই ত একবেলা গেল। গোপীগঞ্জের বাসারে ফলার করে, একলাই চললাম শতখালি। দেড়ক্রোশ বই ত নয়। শীতলকে বলে গেলাম, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। নগা সঙ্গে যেতে চাইল, তাকেও সঙ্গে নিলাম না। তার পর সেই রোডের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে-করে ত চলতে লাগলাম। বাঁধ-রাস্তা ত নেই, মাঠ ভেঙ্গে পথ। আর কিসের দেড় ক্রোশ—পথ আর শেষ হয় না। এদিকে বেলাও বেধি পড়ে যায়। বুকুলেন বড়দা, একেবারে পাকা পাঁচ ক্রোশ—এক রশিও কম নয়। আর পথ ত সেই ঠিক ভেঙ্গে, ভূমির আলুর উপর দিয়ে। যাক, সেই মাড়ে বারটার

সময় বেগ্নিরে চারটার পর শতখালি গিয়ে উপস্থিত। গ্রাম খুব  
 বড়; অনেক ব্রাহ্মণের বাস; অল্প জাতও আছে। গেলান হরচন্দ্র  
 চাটুয্যের বাড়ী। চাটুয্যে মশাই বাড়ী ছিলেন না; নিকটেই  
 কোন্ গ্রামে নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। বাড়ীতে অল্প ধাড়া ছিলেন,  
 তাঁরা পরিচয় নিয়ে খুব আদর-বন্দ করলেন। পাশের বাড়ীরই এক  
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল;  
 বাবা না কি কয়েকবার তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন; তিনিও  
 আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। নাম বললেন হৃষীকেশ গাঙ্গুলী।  
 তিনি বেগের গাঙ্গুলী বড়দা।”

বড় কর্তা বলিলেন, “শতখালির হৃষী গাঙ্গুলীকে আমিও চিনি।  
 বেশ লোক।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “তিনিও আপনার কথা বলেন। যাক্  
 একজন পরিচিত লোক পেয়ে মনে একটু সাহস হোল। তাঁকে  
 সব কথা বললাম। তিনি খুব ভরসা দিলেন। হারু চাটুয্যের  
 ছেলে ভাল, করিমপুরে এক উকীলের মুহুরী; পরমা-কড়ি বেশ  
 উপার্জন করে। বয়স শুন্দলাম সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। তিনটা  
 বিবাহ করেছিল; দুটা মারা গিয়েছে, একটা বেঁচে আছে; সে  
 বাপের বাড়ীতেই থাকে, শ্বশুরবাড়ী আসতে চায় না। সেই জন্ত,  
 ছেলের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা। এই সব কথা শুনে  
 আমার ত ভালই বোধ হোলো, বুকলে বড় বোঁ। সন্ধ্যার সময়  
 হরচন্দ্র চাটুয্যে মশাই বাড়ী এলেন। সন্ধ্যার পর কথাবার্তা  
 হ'ল। চাটুয্যে মশাই বলিলেন যে, তাঁর ছেলের ত বিবাহ কর্তেই

রাজী মর। অনেক বলা-কহার তবে রাজী হয়েছে। তার পর  
বলেন যে, কুলীনের মেয়ে আর কন্নটাই বা খণ্ডরের খর করতে  
পার। আমার ভাইবির বধন সেই দুর্লভ অধিকার পাচ্ছে এবং  
উবিদ্যতেও তার বধন সে অধিকার থেকে যুক্ত হবার সম্ভাবনা  
নেই, তখন হেনা-পাওনা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করতে হবে।  
কথা শুনেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এই বিশেষ বিবেচনাটা কি,  
জানবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করার তিনি বলেন, পাঁচটা হাজার  
টাকার কমে তিনি কিছুতেই ছেলের বিবাহ হেবেন না। আমি  
অনেক কাকুতি মিনতি করলাম; ব্রাহ্মণের একেবারে ধনুকভাঙ্গা  
পণ। তখন আর কি করি, এত রাত্রে পাঁচ কোশ পথ ত আর  
হাঁটতে পারব না। ছবি গান্ধী মহাশয় আমাকে তাঁর বাড়ীতে  
নিরে গেলেন। চাটুয্যে মহাশয়ও তাঁর ওখানেই থাকবার জন্ত অসু-  
রোধ করলেন; আমি তাতে সম্মত হ'লাম না। বাড়ীতে এসে  
গান্ধী মহাশয় বলেন 'শোন হরেকৃষ্ণ, ও বাড়ীতে ব'লে ছেলেটা  
সম্বন্ধে যা বলেছি, তা মিথ্যে নয়; কিন্তু একটা কথা বলি নাই।  
এ ছেলের সঙ্গে তোমার ভাইবির বিয়ে দিও না। আমার খুব সন্দেহ  
হয়েছে যে, ছেলেটার কুষ্ঠরোগ হয়েছে। ওদের সুখে ত সে কথা  
বলা যায় না, তাই তোমাকে বাড়ীতে নিরে এলাম। তোমাদের  
সঙ্গে বহুদিনের পরিচয়—আত্মীয়তা বলেই হয়। জেনে-শুনে  
এমন কাজ করতে কি করে বলি। আর, তার পর খাই ত দেখলে  
—পাঁচ হাজার টাকা।'

তখনই ও-ছেলের চিন্তা ছেড়ে দিলাম। রাজিটা কাটিয়ে তোম

বেলায় বাজা করে, দশটার সময় নৌকার এলাম। তার পর আর কি,—আর কোথাও গেলাম না—একেবারে বাড়ী চলে এলাম।”

বড় বৌ বলিলেন, “বেশ করেছ ঠাকুরপো। লক্ষ্মীর আদৃষ্টে বিয়ে থাকে, হবে,—তুমি আর অমন করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িও না। এই আজ ছবছর কোথায় বা না গেলে বল দেখি। অধু কষ্টই সার হোলো।”

বড় কর্তা বলিলেন, “তাই ভাল করে ওকে বোঝাও বড় গিন্নি! ও আমার সব কথা শুনবে, অধু লক্ষ্মীর বিয়ের কথাই শুনবে না। তাই দেশ-বিদেশ ঘুরে মরছে। এখন দেখলে ত তাই, যদি পাল্টা ঘর মেলে, ত ভাল ছেলে মেলে না। যদি বা ছোট্টই মেলে তা হলে যে টাকার দাবী করে, তা আমাদের বেচলেও হয় না। আমি কি সব দিক্ না দেখে-শুনই চূপ করে আছি। এখন তুমিও ত দেখলে। তবে আর কি,—চূপ করে থাক।”

এই সময় শীতল ও নগা জিনিসপত্র লইয়া আসিল। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, বড় বৌ, সস্তা দেখলাম, তাই এক কলসী গুড় কিনে নিয়ে এলাম।”

বড় বৌ রহস্ত করিয়া বলিলেন, “বা হোক, মিষ্টি-মুখ করবার ব্যবস্থা ত করে এসেছ। বেধ ঠাকুরপো, তুমি আর অমন করে দেশ-বিদেশ করে বেড়িও না। একে তোমরা মহা-কুলীন, পাল্টা ঘর মেলে না; তার পর লক্ষ্মীকে ঘর-তার হাতে ও দিতে পারবে না। তার পর আমাদের এই অবস্থা। আমরা অনেক পুণা, অনেক তপস্বী করেছিলাম, তাই তোমাদের মার করছি : নইলে কুলীনের

মেয়ে বংজন স্বামীর ঘর করতে পার। লক্ষ্মীর অদৃষ্টে নেই,  
'তোমরা কি করবে বল। ও লক্ষ্মী, মা, তোদের কতদূর ?'

লক্ষ্মী বাগ্নাঘর হইতেই বলিল, "আর দেবী নেই মা। দীতল-  
দাকে খান দুই পাতা কেটে আনতে বল।"

নগা বলিল, "পিসিমা, পাতা আমরা নৌকো থেকে নিয়ে  
এসেছি; রাত্তিরে কি গাছের গায়ে হাত দিতে আছে।"

হরেকৃষ্ণ সশাস্ত্রবদনে বলিলেন, "লক্ষ্মী, জেলের ছেলের কাছে  
শাস্ত্রের ঠেকে গেলি।"

লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "শাস্ত্রে আর ও-সব পাতা-কাটার পাতি  
নেই কাকা! ও সবই তোমাদের হাতে-গড়া।"

বড় কর্তা বলিলেন, "হাতে-গড়া যে, সে ঠিক কথা; কিন্তু ওর  
মানে আছে মা! শাস্ত্রই বল, আর দেশাচারই বল, অনেক চিন্তা  
করে, অনেক ভেবে তা দেশে প্রচলিত হয়েছে।"

বড় গিন্নী বলিলেন, "এত রাত্রে আর শাস্ত্র-কথার কাজ নেই;  
এখনই মেয়ে এসে তুর্ক জুড়ে দেবে, রান্না-বাড়া বন্দ হয়ে থাকে।  
লক্ষ্মী মা, শাস্ত্র কা'ল হবে, এখন শীগ্গির করে ভারত বেড়ে দে;  
তোমর কাকার যে সারাদিন পেটে অন্ন পড়ে নাই।"

বাগ্নাঘরের বারান্দায় আলো দেখিয়া ও পিড়ি পাতিবার লক্ষ  
ভূনিয়া বড়গিন্নী বলিলেন, "ঠাকুরপো, ছটো বা ছয় সুখে দেও।"  
এই বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "বড় বৌ,  
তোমার অন্ন, তুমি আর বাচ্ছ কেন? তুমি বোস।"

:"দামান্ত একটু অন্ন, তার জন্ত কি হবে, চল।" এই

বলিয়া বড় বৌ রান্নাঘরের দিকে বাইতে-বাইতে বলিলেন,  
“শীতল, বাবা, এইখানে একটু জলছড়া দিয়ে, পাতা নিয়ে বোস।  
লক্ষ্মী, বাইরে একটা আলো বে দিতে হবে।”

শীতল বলিল, “আর আলো লাগবে না, এমন চাঁদের আলো  
রয়েছে।”

“না, না, তা কি হয়!” এই বলিয়া বড় বৌ শয়নঘরে কিরিয়া  
গেলেন এবং ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ ছিল, তাই আনিয়া দিলেন।

হরেকৃষ্ণ রান্নাঘরের বারান্দার আহার করিতে বসিলে  
ছোটবৌ বাহিরে শীতল ও নগার ভাত দিয়া গেলেন। বড়  
বৌ বলিলেন, “শীতল, তাড়াতাড়িতে এত রাত্তিরে শুধু মাছের  
কোল, আর ভাত। তোমাদের বড় কষ্ট হোলো। তা দেখ,  
কা’ল তোমরা এসে প্রসাদ পেয়ে যেও। তোমার মেয়েকেও  
সঙ্গে করে এন, বুঝলে।”

শীতল বলিল, “মা-ঠাকরুণ, আপনাদেরই ত খাচ্ছি। এই  
ত বেশ খাওয়া হোলো, কা’ল আবার কেন?”

“না, না, সে হবে না, কা’ল নিশ্চয়ই এস।”

নগা বলিল, “তা আস্ব বৈ কি! গিসিঠাকরুণ, আর  
একটু কোল দেবে গো!”

লক্ষ্মী খানিকটা কোল ও মাছ দিয়া গেল। হরেকৃষ্ণ গল্প  
আরম্ভ করিতেই বড়বউ বলিলেন, “হরি, আর না, খেয়ে উঠেই  
শোওগে, তোমার অবশিষ্ট গল্প কা’ল শোনা যাবে।



গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। সারা গ্রামখানি খানাতলাস করিলেও কাহারও অন্তঃপুরে যথেষ্ট পরিমাণে কাঞ্চন মিলিত না,—সকলেই গরীব। বাহাদের কিকিং জমিজমা আছে, তাহারা ছই বেলা ছই মুষ্টি ধাইতে পায়; আর বাহাদের সে সব কিছু নাই, তাহাদের কেমন করিয়া দিনপাত হয়, তাহা তাহারাই জানে; আর জানেন, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রক্ষা করিতেছেন। গ্রামে সাত আট ঘর ব্রাহ্মণ আছেন—সকলেই কুলীন; সকলেরই অবস্থা সমান। অন্ন দু'শজন ব্রাহ্মণ কাঞ্চন-সন্তান অন্নবিস্তর লেখাপড়া শিখিয়া, কেহ বা বিদেশে চাকুরী করিতেছে; কেহ বা বাড়ীতে বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতেছে; আর বাহা করিতেছে, তাহা পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা বৈশ জানেন। সহরের বাবুদিগের অবগতির জন্ত নিবেদন করিতেছি যে, এই অন্নসংখ্যক নিষ্কর্মা যুবক পাড়ায় আড্ডা দেয়, অবৈতনিক যাত্রা ও থিয়েটারের দল করে, পরনিন্দা পরচর্চা করে; আর বাহা করে, তাহা স্তনিয়া কাজ নাই।

এ-হেন কাঞ্চনপুর গ্রামে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়গণের বাস। তাহাদের কিছু জমাজমি আছে, পঁচিশ ত্রিশ ঘর বসমান আছে;



তাহাতেই এক রকম গ্রামাচ্ছাদন চলে। বড় কর্তা রামকৃষ্ণ  
 বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পণ্ডিত বলিয়াও খ্যাতি আছে। কালে-  
 ক্ষত্রে ব্যবস্থা-পীতি দিয়া কিকিং পাইয়াও থাকেন। ছোট  
 কর্তা হরেকৃষ্ণ জন্মজন্মা দেখেন, ঘরগৃহস্থালীর কাজবন্দ্য করেন।  
 বাড়ীতে ছেলেপিলের মধ্যে বড়কর্তার এক কন্যা লক্ষ্মী—বাণের  
 আমরিণী, কাকার নয়নের মণি ও কাকীর ছায়াস্বরূপিনী,  
 গৃহস্থের আনন্দদায়িনী, পাড়া-প্রতিবেশীর চক্ষে সত্যপত্নী লক্ষ্মী-  
 স্বরূপিনী। এমন স্বরূপা, সুশীলা মেয়ে কোলীতে আট ঘাট-  
 বাধা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা  
 দিন ছুনিয়ার মালিক বলিতে পারেন। অনেক পিতামাতা  
 ঈশ্বর করিয়া চকুধীন সম্বানের পদ্মলোচন নামকরণ করিয়া  
 থাকেন; অনেক মদীকৃষ্ণ পুরুষকে গোরাচাঁদ নামে অভিহিত  
 হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু যাহারা রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-  
 শয়ের কন্যার লক্ষ্মী নামকরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই  
 চকুমান্ব ব্যক্তি;—লক্ষ্মী প্রকৃতই লক্ষ্মী; রূপেও লক্ষ্মী, গুণেও  
 লক্ষ্মী,—অদৃষ্টে কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া, তাহা পূর্বেই বলিয়া রাখি-  
 লাম। তাহা না হইলে একপ মেয়ে কি বাংলাদেশে দারী-  
 শ্রেণীর বরণ্য কুলীন-গৃহে জন্মগ্রহণ করে? তাহা না হইলে  
 কি গরীব বাঙ্গালীও মেয়ে হইয়া, ফরিদপুর জেলার মধ্যে এই  
 সুদূর বাঞ্চনপুর পল্লীতে দৌলীত্বের বেড়া-জালের মধ্যে আটক  
 পড়ে? তাহা না হইলে এত সাধের মেয়েকে বিবাহ দিতে  
 না পারিয়া পিতা, খুড়া গভীর মনঃকষ্টে নিরাম

হৃদয়ে ভবিষ্যতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন ?

মনে উঠিতেছে বহুদিন পূর্বের একটা শোচনীয় দৃশ্য। তখন এই ষাট বৎসরের বৃদ্ধ লেখক কুড়ি-একুশ বৎসরের নবীন যুবক। এত দীর্ঘকালেও সে দৃশ্যের স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। সেই সময় ফরিদপুর জেলার একটা ক্ষুদ্র গ্রামে একদিন একটা বিবাহ সভায়—কথাটা ঠিক হইল না কুমারী বলিমান সভায় হর্ভাগ্যবশতঃ উপস্থিত ছিলাম। একটা অশীতিপর বৃদ্ধ বরের আসনে উপবিষ্ট। আমি ত তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে গলাঘাত্য ব্যবস্থা দিতে পারিতাম; এবং বিশিষ্ট নাড়ী-জ্ঞানসম্পন্ন কবিরাজ মহাশয়ও আমার ব্যবস্থার ক্রটি ধরিতে পারিতেন না। সেই বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কুমারী নাম যুচাইবার জন্ত ৬০ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম বর্ষ বয়স্ক দশটী কি এগারটী কুমারীকে সভাস্থ করা হইয়াছে। বাস্তবতাও নাই, শম্মলানি নাই—কেবল রমণী-কণ্ঠের গভীর আর্তনাদে পল্লীর গগন-পবন আকুল হইতেছে! এখনও—এককাল পরেও—যখনই সেই দৃশ্যের কথা মনে হয়, তখনই সেই হৃদয়ভেদী আর্তনাদ, সেই অস্থিচূর্ণকারী হাদ্যকার ধ্বনি শুনিতে পাই! ভগবানকে প্রশ্ন কর, এখন এমন শোচনীয় কাণ্ডের কথা বড়-একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে একেবারেই এ কৌণীজ লোপ পায় নাই;—লোপ পাইলে বর্তমান কাহিনী লিখিবার প্রয়োজন হইত না। এক কথা বলিতে বসিয়া আর এক কথা আসিয়া

পড়িয়াছে,—গল্প লিখিবার 'আর্ট' না জানার এই প্রধান  
দোষ। বাক্য, এখন বক্তব্য কাহিনীর অনুসরণ করা বাড়ুক।

কাঞ্চনপুরে অনেকগুলি নিকটীয়া খুবক ছিল। তাহাদের  
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাদের কাহারও কাহারও কু-দৃষ্টি লক্ষ্মীর  
উপর পতিত হইয়াছিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া লক্ষ্মীর  
সম্মুখীন হইতে পারে নাই। সকলেই বুঝিয়াছিল, এ মেয়ের  
শরীরে হস্তার্পণ করা, বা তাহাকে কোনপ্রকারে লুক্ক করা  
অসাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্মী গৃহকর্ম করিত; অবসর সময়ে হর  
পিতার নিকট বসিয়া শাস্ত্রের কথা শুনিত, পিতার সহিত  
নানা বিষয়ের আলোচনা করিত; কখনও বা মা ও কাকীর  
সহিত গল্প করিত; বিশেষ আবশ্যক বাতীত কখনও বাড়ীর  
বাহির হইত না। বিবাহ সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া-  
ছিল। তাহার মনে কি হইত, তাহা ভগবানই জানেন; কিন্তু  
বাহিরে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিত না। কুলীন  
ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে বাহা অনেক সময়েই অপরি-  
হার্য, তাহার জন্ম দ্বন্দ্ব করিয়া কি হইবে? তাহাকে চির-  
জীবন কুমারী অবস্থাতেই বাপন করিতে হইবে, এ কথা সে  
বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার জীবন সে পিতামাতার  
সেবাতেই অভিবাহিত করিতে হইবে, বিধাতা যে তাহার  
অদৃষ্টে দাম্পত্য-সুখভোগ লেখেন নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতে  
পারিয়াছিল;—গ্রামেও সে অনেক রমণীকে এই অনাদৃত জীবন  
অতি কষ্টে বহন করিতে দেখিয়াছে। বরঞ্চ তাহার সমশ্রেণীর

অজ্ঞান কুমারীর অপেক্ষা সে ভালই আছে। বাড়ীতে কেহই তঁর তাহাকে অনাদর করে না—সেই যে বাড়ীর একমাত্র সম্ভান—পিতা ও পিতৃব্যের বড় আদরের আধারিণী। তাহাকে স্নেহে রাখিবার জন্ত সকলেই সচেষ্ট। আর তাহার কুমারী-জীবন ঘুসাইবার জন্ত পিতা, পিতৃব্য ত চেষ্টার জটা করেন নাই। এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করিয়া সে এই কুমারী-জীবনই বরণ করিয়া লইয়াছিল।

মানুষ বাহা ভাবে, মানুষ নিজের জীবন যে পথে পরিচালিত করিবার জন্ত সক্ষম করে, তাহা যদি সকল হইত, তাহা হইলে পৃথিবীময় এত হাহাকার, এত আশা-ভঙ্গের আর্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত না; এবং দীর্ঘকালে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইত না; এত কাতর আবেদন শুনিতে হইত না। আমরা মনে করি, ইহা করিব,—উহা করিব, কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের ভাগ্য-বিধাতা আমাদের জন্ত যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে এক পদও স্বেচ্ছায় চলিবার ঘো নাই। আমি স্থির করিলাম, উত্তর দিকে যাইব, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তিবলে আমার গতি পূর্ববাহিনী হইল। আমি মনে করিলাম, নিশ্চিন্ত মনে জীবন কাটাইব, কোথা হইতে নানা জঞ্জাল, নানা উপদ্রব আগিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। কোন দিনই ত আমরা নিজের ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে পারি না। আমরা ভাবি এক, হইরা বসে আর এক। লক্ষ্মীর জীবনেও তাহাই হইল। সে মনে করিল, দূর

হটুক, বিবাহের চিন্তা আর সে করবে না; সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া পিতামাতার সেবা, সংসারের কার্যকর্ম করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে। যাহার প্রতিবিধান তাহার সাধ্যান্ত নয়, তাহার জন্ত হা হতাশ করিয়া সে জীবন অশান্তিময়, ভারাক্রান্ত করিবে না; কিন্তু ভাগ্য-নিয়ন্তা তাহার জন্ত যে পথ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সে কেমন করিয়া অতিক্রম করিবে? সেখানে ত তাহার দৃষ্টি চলে না; ভবিষ্যতের ধ্বনিকা উত্তোলন করিয়া তাহার কথা ত কেহ তাহাকে বলিয়া দিতে পারে না;—এমন কেহ নাই, যিনি তাহাকে পূর্বাঙ্কে সাবধান করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে ত আর কথাই ছিল না। যে ভয়ানক বিপদ বন্দীকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাহার সংবাণ কেহই তাহাকে দিতে পারে নাই,—নাহু-বের সে সাধা নাই।

প্রতিদিন যেমন রাত্রিতে গৃহকর্ম শেষ করিয়া সকলে বিশ্রাম করেন, আজও তেমন সকলে রাজি আটটার পরেই শয্যা গ্রহণ করিলেন। পল্লী-অঞ্চলে সকাল-সকালই সকলের বাড়ীরই কাঁধা শেষ হয়। রাজি ১০টার পরে আধিকা পল্লীতেই জনমানবের সাড়া-শব্দ থাকে না, সমস্ত গ্রামখানি নিস্তার কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। শুধু জাগিয়া থাকে চোর, আর কুকিয়াসক্ত মানব-দেহধারী ইতর জীব।

সহরের বাড়ীঘর যেমন চারিদিকে আটকান থাকে, একটা কি দুইটা নাজ প্রবেশ দ্বার থাকে,—সেই দ্বার বন্ধ করিয়া

দিলেই বাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশলাভ চুঃসাধ্য হইয়া পড়ে,—  
 গুল্মীক্রমে গৃহস্থের বাড়ী তেমন আঁটারাটা প্রায়ই থাকে না।  
 বাহারা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের বাড়ী-ঘর প্রাচীর-বেষ্টিত থাকে,  
 এবং তাহাতে প্রবেশ করাও সহজসাধ্য নহে; কিন্তু গরীব  
 গৃহস্থের বাড়ীতে সদর অন্তর থাকিলেও এদিক-ওদিক দিয়া  
 অনায়াসেই বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। গরীব গৃহস্থেরা এ  
 বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও তেমন অনুভব করে না।  
 বন্দোপাখ্যার মহাশয়দিগের বাড়ীও অনেকটা সেই রকম ছিল।  
 বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে ভিতরের প্রাঙ্গণে আসিতে হইলে একটা দ্বার  
 অতিক্রম করিতে হইত; সেই দ্বার বন্ধ করিলেই যে অস্তঃপুর  
 একেবারে আবদ্ধ হইত, তাহা নহে; আনাচ-কানাচ দিয়া অনায়া-  
 সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করা যাইত।

ভিতর বাড়ীতে তিনখানি শয়নের ঘর। তাহার একখানিতে  
 ছোট কর্তা হরেকৃষ্ণ সন্ন্যাসী থাকিতেন; আর একখানিতে এক  
 পার্শ্বে বড়-কর্তা শয়ন করিতেন, এবং দ্বিতীয় বিছানায় লক্ষ্মী মায়ের  
 কাছে থাকিত। অপর ঘরখানিতে কেহ শয়ন করিত না; জিনিষ-  
 পত্র থাকিত। রাজিতে সেখানি চাবিবদ্ধ থাকিত।

ইতিমধ্যে একদিন রাজি যখন এগারটা কি বারটা, তখন  
 লক্ষ্মী বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে গেল; বড় গিন্নীর তখন নিজার  
 ঘোর; তবুও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, মেয়ে বাহিরে গেল।  
 সকলেই এমন ভাবে রাজিতে ছুই একবার উঠিয়া থাকে।

প্রায় একঘণ্টা পরে বড় গিন্নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকারের

মধ্যেই শয্যাপার্শ্বে হাত দিয়া বেথেন, লক্ষ্মী নাই। তিনি তখন  
 তাকাতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। তিনি বেশ বুকিতে পারিলেন যে,  
 লক্ষ্মী অনেকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছে। ঘরের দিকে চাহিয়া  
 দেখিলেন, ঘর খোলা পড়িয়া আছে। তিনি তখন শয্যাভ্যাগ  
 করিয়া বাহিরে আসিলেন; কোন কথাবার্তা না বলিয়া এদিক-  
 ওদিক অহুসকান করিলেন; ঘরের পশ্চাতে বাইয়াও দেখিলেন।  
 বাড়ী-সংলগ্ন যে বাগান ছিল, সে-দিকেও গেলেন; কিন্তু কোথাও  
 লক্ষ্মীর সাড়াশব্দ পাইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে,  
 লক্ষ্মী হয় ত শৌচে গিয়াছে। পল্লীগ্রামে কাহারও বাড়ীতেই  
 শৌচাগার বড়-একটা থাকে না; পুরুষেরা মাঠে যান, স্ত্রীলোকেরা  
 বাড়ীর নিকটে বাগানে বা জঙ্গলে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীর  
 যা তাহাই মনে করিয়া বাগানের দিকে গিয়াছিলেন। জ্যোৎস্না  
 রাত্রি; চারিদিকই সমস্ত দেখা বাইতেছিল। তিনি যখন কোথাও  
 লক্ষ্মীর সাড়া পাইলেন না, তখন তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।  
 তাকাতাড়ি ঘরের মধ্যে বাইয়া ডাকিলেন, "ওগো, একবার  
 ওঠ ত ?"

এই অকস্মাৎ অংহ্বানে বড়-কর্তার ঘুম জাঙ্কিয়া গেল; তিনি  
 বলিলেন, "কি ? ডাকছ কেন ?"

বড় গিন্নী বলিলেন, "লক্ষ্মীকে যে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।"

"অ্যা বল কি ? লক্ষ্মী ? কোথায় গেল ? সে ত  
 তোমার পাশেই শুয়ে ছিল।"

"আমার পাশেই শুয়ে ছিল। খানিকক্ষণ আগে সে উঠে

দুয়ার খুলে বাহিরে গেল; এখন ত গিয়াই থাকে। আমার চোখের উপর ঘুম চেপে এসেছে, আমি একটু ঘেন সাজা পেলাম, তারপরই ঘুমিয়ে গিয়াছি। এখন হঠাৎ জেগে দেখি, মেয়ে ত বিছানায় নেই। কতক্ষণ হোল সে যে বাহিরে গেছে, তাও ক ঠিক বলতে পারছি নে। তুমি ওঠ, একবার দেখ, মেয়ে কোথায় গেল।”

বড়-কর্তা এই কথা শুনিয়া এমন আড়ষ্ট হইয়া গেলেন যে, ভখন কি কর্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; শুধু বলিলেন, “তাই ত!”

বড় গিন্নী বলিলেন, “তুমি আর এত রাত্ৰিতে কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় খোঁজ করবে। ঠাকুরপোকে ডেকে তুলি।” এই বলিয়া তিনি বাহির যাইতে উদ্ভত হইলে বড়-কর্তা বলিলেন, “দেখ গিন্নি, চেষ্টামেচি কোরো না; গোলমালে কাজ নেই। আন্তে আন্তে হরিকে ডেকে আন; তারপর পরামর্শ করা যাক। তুমি সব দিক দেখেছ ত গিন্নি!”

বড় গিন্নী বলিলেন, “আমি সব জায়গা খুঁজে দেখে তারপর ত তোমাকে ডেকেছি।”

বড়কর্তা বলিলেন, “ভা হলে আর দেয়ী কোরো না; যাও হরিকে ডেকে আন। হা মা দুর্গে, এ কি করলে মা!”



বড় গিন্নী হরেকৃষ্ণের ঘরের দাবায় উঠিয়া ধীরে-ধীরে ঘায়ে করাঘাত করিলেন, কথা বলিবার বা ডাকিবার সাহস তাঁহার হইল না।

ভিতর হইতে হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “কে ?”

বড় গিন্নী উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া হরেকৃষ্ণ নীরব হইলেন, মনে করিলেন তাঁহার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু একটু পরেই আবার ঘায়ে করাঘাতের শব্দ হইল। হরেকৃষ্ণ তখন শয্যাভাগ করিয়া ঘর খুলিয়া দেখিলেন, বড় গিন্নী ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

এত রাতিতে, এমন অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া হরেকৃষ্ণ সভয়ে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “বড় বৌ, তুমি এত রাতে ? কি —” তাঁহাকে আর কথা সমাপ্ত করিতে হইল না; বড় গিন্নী কাঁদিয়া বলিলেন “ঠাকুরপো, সন্নী ?”

“সন্নী! সন্নীর কি অস্থখ করেছে? তা, সেজন্তে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? চল, দেখিগে কি অস্থখ হোলো। এই ত সন্ধ্যার সময় সে বেশ ছিল, এরই মধ্যে কি হোলো।”

বড় গিন্নী আর হির খাটিকতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ঠাকুরপো, সৰ্কনকি ছয়েছে, লক্ষ্মী ঘরে নেই।"

"লক্ষ্মী ঘরে নেই, তুমি কি বলছ, ঠাকুরপো? ঘরে নেই ত কোথায় গেল?"

"তা ত জানিনে ঠাকুরপো! একটু আগে হঠাৎ মেগে দেখি লক্ষ্মী আমার পাশে শুয়ে নেই; ঘরের দুয়ার খোলা পড়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে সব দিক খুঁজে দেখলাম, কোথাও তাকে পেলাম না। তাই তোমাকে ডাকতে এসেছি। ঠাকুরপো ঘরে আমার কোথায় গেল?"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "দাদা উঠেছেন, তিনি শুনেছেন?"

"তাকেই" অগ্নে ডেকেছি। তিনি তোমাকে ডাকতে বললেন।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "চল, দাদার কাছে বাই। তুমি ত বাগানের দিকটা ভাল করে দেখেচ বড় বো! পুকুরের ঘাটে গিয়েছিলে? মা আমার ত অভিমানে জলে বাঁপ দেয় নি।" এই বলিয়া তিনি যে ঘরে বড়-কর্তা ছিলেন, সেই ঘরে গেলেন। দেখিলেন, তাঁহার দাদা মাথার হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

হরেকৃষ্ণকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "হরি, শুনেছ, লক্ষ্মীকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

হরেকৃষ্ণ সাহস দিয়া বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না দাদা। বড় বো কি আর খুজতে পেরেছেন। লক্ষ্মী হয় ত বাগানের দিকে গেছে, এখনি আসবে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, “না হরি, বড় গিন্নী বা বলছেন, তাতে মনে হয় লক্ষ্মী একঘণ্টা বেড়ঘণ্টা আগে স্বরথেকে বেরিয়েছে। এতক্ষণ সে বাইরে থাকবে কেন—আর এই রাত্রিতে।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “হয় ত পুকুরে গিয়েছে। আমি পুকুরের দিকটা আর বাগানটা ভাল করে দেখে আসি।”

হরেকৃষ্ণ পুকুর বাগান প্রকৃতি স্থান অন্বেষণ করিয়া দশ মিনিট পরে কিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “ঠিক না, কোথাও ত লক্ষ্মীকে দেখতে পেলাম না, কোন চিহ্নও ত পেলাম না। এখন কি করা যায় ?” হরেকৃষ্ণ হতাশভাবে ঘরের মেঝের বসিয়া পড়িলেন।

নীরব রজনী—প্রকৃতি নীরব, পৃথিবীর মধ্যে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নীরবে শব্দ্য উপবিষ্ট,—ঘরাসনে উঁহার স্নেহময় কনিষ্ঠভ্রাতা নীরব, ঘরের পার্শ্বে বসিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিনী বড় গিন্নী নীরব,—উঁহার পার্শ্বে কল্পনাময়ী ছোটবধু নীরব;—আকাশের চন্দ্রও নীরবে কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। বাহিরে সকলই নীরব; কিন্তু এই নিশীথ সময়ে এই কয়টি মানবের হৃদয়ের মধ্যে কে জীবন আর্তনাদ উঠিতেছিল, তাহা যদি বাহির হইবার পথ পাইত তাহা হইলে গ্রামের গগন-পবন সেই আর্তনাদে পূর্ণ হইয়া বাইত। বাহ্যিক কল্প গভীর আর্তনাদ—এই প্রাণশক্তি হাহাকার, কোথায় সে!

এই নীরব শোক-প্রবাহ হরেকৃষ্ণকে আকুল করিয়া তুলিল; তিনি অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “কি হবে দাদা ?”

রামকৃষ্ণের স্বপ্ন মথিত, গিষ্ট করিয়া শব্দ উঠিল, "কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ তাই হরেকৃষ্ণ! আর কি হবে? কাল সকালে জানাজানি হবে, কাকনপুরের রামকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা, হরেকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুলত্যাগিনী হইরাছে। আত্মীয়-স্বজন, মশত্রুদের লোকের কাছে মুখ দেখান, তার হবে; কলঙ্কে দেশ পূর্ণ হবে। আরও কি হবে, শুনবে তাই? এই কলঙ্কের বোঝা মাথার করে দেশে বাস করা অসম্ভব হবে। তোমাদের হাত ধরে আমার এই সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে দেশান্তরে,—যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, আমাদের পরিচয় জানে না,—সেইখানে চলে যেতে হবে। তারপর উদরানের জন্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। আরও শুনবে তাই!—তার পরে ভগ্নহৃদয়ে তুমি আমি নরকে চলে যাব;—নরকেই যেতে হবে তাই;—এমন কুলত্যাগিনী মেয়ের যে জন্মশাতা, নরক ছাড়া তার অন্য গতি নেই। তারপর ঐ দুই হতভাগিনী বিধবা ঘারে-ঘারে ভিক্ষা করে জীবনপাত করবে। এমনই করে বংশ লোপ হয়ে যাবে। আর কি হবে?"

হরেকৃষ্ণ আর সঙ্ক করিতে পারিলেন না; ভীত্ব কর্তে বলিয়া উঠিলেন, "না, দাদা, তা হতেই পারে না। আপনাকে বলছি, যা আমার কুলত্যাগিনী হয় নাই। এ কথা গ্রাণ থাকতে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারব না। সে হতেই পারে না। লক্ষ্মী কুলত্যাগ করবে, লক্ষ্মী চলে যাবে, আমাদের কুলে কালী দেবে, ঐ হতেই পারে না। আপনি ভুল করেছেন দাদা?"

“ভুল ভা হলে তেঁকে যাও ভাই! বল, সে ভট্টাচার্য্য-  
 দেয় পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে; বল, তার মৃতদেহ পুকুরের  
 জলে ভেসে উঠেছে। বল, সেই কথাই বল।”

“আমি তাই ভাবছি দাদা!”

“বেশ, তাই ভাব—তাই তেবেই তোমার ব্রাহ্ম মনকে প্রবোধ  
 দাও। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভাই, কি ছুখে লক্ষ্মী, আমার বড়  
 মেহের কন্যা লক্ষ্মী, তোমার আদরিণী লক্ষ্মী, মা-খুড়ীমার নয়নের  
 মণি লক্ষ্মী, কোন ছুখে আত্মহত্যা করবে?”

“কোন ছুখে? কুলীনের মেয়ের জীবনই ত ছুখের দাদা!  
 লক্ষ্মী বাপমায়ের মেহ পেয়েছে, সংসারে তার খাওয়া-পায়ার  
 অভাব হয় নাই, মেহ-ভালবাসার অভাব হয় নাই; কিন্তু এই  
 কি নারী-জীবনের সব? এরই জন্ত কি ভগবান তাকে সৃষ্টি করে-  
 ছেন। তার প্রাণ কি আর কিছুই চায় না দাদা? আপনি জানী,  
 আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি পণ্ডিত। মেয়ের জীবনে কি আর  
 সাধ-আল্লাদ নেই? আর কি কোন বাসনা নেই?”

“আছে ভাই, আছে। সেই বাসনা পূর্ণ করবার জন্তই সে  
 বাপ-মায়ের দিকে চেয়ে দেখলে না;—বংশগরিমার দিকে চাইল  
 না। প্রবৃত্তি তাকে যে দিকে নিয়ে যেতে চাইল, সেইদিকে সে  
 চলে গেল। না ভাই, বৃথা কথা তেবে মনকে প্রবোধ দিও না।  
 যা হতে পারে না, যা হয় নাই, সে কথা তেব না। মন দৃঢ়  
 কর, লক্ষ্মীর কথা ভুলে যাও ভাই। মনে কর আমার কেউ  
 নেই। মা দুর্গভিনাশিনি, এ কি করলে মা?”

“আপনি যাই বলুন দাও, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি  
নে। সন্দেহী কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না—কিছুতেই  
না। আজ সতরো বছর তাকে দেখে আসছি, একদিন আধ-  
দিন নয়—সতরো বছর তাকে কোলে করে মানুষ করেছি। সে  
এমন হতেই পারে না। আপনি ও-কথা মনেও স্থান দেবেন  
না। না, না, সে কিছুতেই সম্ভব নয়—কিছুতেই না। আপনারা  
চুপ করে থাকুন। গোলমাল করে লোক-জানাজানি করবেন  
না। আমি একবার ভাল করে খুঁজে দেখে আসি। সারারাত্রি  
খুঁজে দেখব—বন-জঙ্গল খুঁজে দেখব। তারপর যা হয় হবে;  
যে বোঝা বইতে হয় বইব। বড় বৌ, লর্ডনটা ঝেলে দাও ত।  
কৈদ না বড় বৌ! সন্দেহী আমাদের ছেড়ে যেতে পারে না।  
পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু সন্দেহী কুলত্যাগিনী  
হতে পারে না,—তোমার মত সতীমায়ের মেয়ে কিছুতেই কুপথে  
যেতে পারে না বড় বৌ। এ আমার স্থির বিশ্বাস। তোমরা  
কিছু ভেব না। আমার মন বলছে, কিছু একটা দুর্ঘটনা হয়েছে।  
আমি যাই, আর বিলম্ব করব না। রাতও বোধ হয় আর বেশী  
নেই। আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি, তোমরা কিছু  
কোরো না।”

ছোট বৌ ইতিমধ্যেই লর্ডন জালিয়া আনিয়াছিল। হয়েকক্ষ  
ধখন বাহির হইবেন, তখন রামকৃষ্ণ বলিলেন, “ভাই হরি,  
কেন আর বস্তু করবে? বা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন  
হীনর্ধক পথে-পথে ঘুরে কি হবে?”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “না দাদা, আমি একবার চারিদিকে  
সন্ধান না নিয়ে থাকতে পারছি নে।”

হরেকৃষ্ণ বাড়ীর বাহির হইলেন। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া  
ঊর্ধ্ব চিন্তা হইল, এখন কোন্ দিকে যাই। উত্তর দক্ষিণ  
পূর্ব পশ্চিম, সব দিকই ত আছে। কোথায় তাহার অনুসন্ধান  
করিব।

হঠাৎ ঊর্ধ্ব মনে হইল, পুকুরটা আর একবার ভাল  
করিয়া দেখা যাক। তখন তিনি ভট্টাচার্যদিগের পুকুরের  
দিকে গেলেন। লষ্ঠন ধরিয়া অনেকক্ষণ পুকুরের দিকে চারিদিক  
রহিলেন। জলে সামান্য একটু চাঞ্চল্যও তিনি দেখিতে পাইলেন  
না; পুকুরের চারিপাশ বিশেষ মনোযোগের সহিত ছুরিয়া দেখি-  
লেন, কোথাও পায়ের দাগ, ঘাসপাতার অপসারণের কোন  
চিহ্নই দেখিলেন না।

পুকুরের তীর ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় রাস্তায় উঠিলেন।  
একবার মনে হইল গ্রামের পূর্বদিকে যে বাগানগুলি আছে,  
সেই দিকেই যান; পরক্ষণেই ভাবিলেন, দক্ষিণ দিকের মাঠটাই  
একবার দেখিয়া আসি, তাহার পর বাগানের দিকে যাওয়া  
যাইবে।

রাস্তার পাশেই ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের বাড়ি। বাহিরের  
ঘরখানি একেবারে রাস্তার ধারে। হরেকৃষ্ণ যখন সেই বাড়ীর  
সম্মুখে আসিলেন, তখন সেই ঘরের বারান্দা হইতে শব্দ হইল,  
“কে যার?”

বুদ্ধ মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বাহিরের ঘরেই থাকিভেন ।  
এ শর তাঁহারই । হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “আজ্ঞা, আমি হরেকৃষ্ণ  
কাকা মশাই ।”

“হরেকৃষ্ণ, তা বাবা, এত রাত্রে কোথায় বাচ্ছ ? বাড়ীতে  
কি কারও অনুখ-বিসুখ হয়েছে ।”

হরেকৃষ্ণ মহা বিপদে পড়িলেন ; বুজের প্রশ্নের কি উত্তর  
দিবেন, সহসা ভাবিয়া পাইলেন না । মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত  
উপায়ান্তর নাই । একটু চুপ করিয়া থাকিগাই বলিলেন, “এই  
রাত্ৰি গাইটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়া গিয়েছে, কাকা মশাই !  
গোয়ালে শক তুনে উঠে দেখি রাত্ৰি গাইটা নেই । কার ক্ষেতে  
ধান থাকে, কে হয় ত খোঁচড়ে দেবে, না হয় বেঁধে রাখবে ;  
তাই সেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছি । আপনি এখনও জেগে  
কাকা মশাই !”

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “আরে বাবা, আমার কথা আর  
জিজ্ঞাসা কর কেন ? আমার কি রাত্তিরে ঘুম আছে । উঠ-বস  
করেই রাত কাটে । এই একটু শুস্তার মত হরেছিল, আর  
অমনি জেগে উঠেছি । তা বাও বাবা, দেখগে গরুটা কোথায়  
গেল । আজকালকার দিনে গরু পোষাও এক হাদামা হয়েছে ।”

হরেকৃষ্ণ আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন । গ্রাম  
ছাড়িয়া একেবারে মাঠের রাস্তায় পড়িলেন । কোথাও জনমানবের  
সম্পর্ক নাই । এত রাত্তিতে মাঠে কে থাকিবে ? হরেকৃষ্ণ  
একবার মনে করিলেন, এ-দিকে আর অগ্রসর হইয়া কি



হইবে, কিয়ং বাগানের দিকেই বাই। আবার মনে করিলেন, এতদূরই যখন আসিয়াছি, আরও একটু আগাইয়া দেখি; এখনও ত রাত আছে। এই দিকেই আর একটু বাই।

একটু অগ্রপর হইতেই দেখিলেন রাত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটু দূরে দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। হরেকৃষ্ণ হাঁকিলেন, “কে ওখানে?”

তাঁহার ডাক শুনিয়াই লোক কয়েকটা মাঠের মধ্য দিয়া অপর দিকে দৌড়িল। হরেকৃষ্ণের মনে সন্দেহ হইল। তিনি তখন যেখানে লোক কয়েকটা দাঁড়াইয়া ছিল, সেই অভিমুখে দৌড়িলেন। অধিকদূর যাইতে হইল না—একটু বাইয়াই দেখিলেন কাহার দেহ মাঠের মধ্যে পড়িয়া আছে। হরেকৃষ্ণ নিকটে বাইয়া দেখেন লক্ষ্মী অট্টোত্তম অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তিনি তখন লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার নাকের নিকট হাত দিয়া দেখিলেন নিঃশ্বাস বহিতেছে; নাড়ী পরীক্ষা করিলেন—নাড়ীর গতি আছে। ডাকিলেন “লক্ষ্মী, মা আমার!”

উত্তর নাই—বুঝিলেন লক্ষ্মী মৃচ্ছিতা! আর বিলম্ব করা চলে না!

হরেকৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীটী নিবাইয়া সেখানে রাখিয়া দিলেন—আলো দেখিয়া পাছে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়;—আলো লইয়া বাইবারও উপায় ছিল না। লক্ষ্মীর অট্টোত্তম দেহ স্বল্পের উপর কেলিয়া হরেকৃষ্ণ গ্রামের দিকে দৌড়িলেন।

হাঁকাইতে হাঁকাইতে বাড়ীতে পৌছিয়া লক্ষ্মীর অচেতন দেখে  
'বারান্দার শোরাইয়া' দিয়া বলিলেন "এই নেও বড় বৌ তোমার  
লক্ষ্মী। শিগ্গীর জল নিয়ে এস, বাতাস কর, লক্ষ্মী অচেতন  
হইয়াছে।"

সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টায় লক্ষ্মীর জ্ঞান সঞ্চার করিলেন।  
লক্ষ্মী চারিদিক চাহিয়া একবার অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "মা গো।"  
ডাহার পরই পুনরায় অচেতন হইয়া পড়িল।

-----

পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মী সংজ্ঞালভ করিল; কিন্তু তখন তাহার ভয়ানক জ্বর। হরেকৃষ্ণ রাত্রিতেই সকলকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাত্রির ঘটনা যেন যুগান্তরেও কাহারও কর্ণগোচর না হয়, তাহা হইলে লোক-নিন্দার ত সীমাই থাকিবে না—ঊর্ধ্বাধিকারকে একঘরে হইতে হইবে। লক্ষ্মীর জ্বর হইয়াছে, এই কথাই প্রকাশ থাকিবে। লক্ষ্মীকেও এই ব্যাপার সম্বন্ধে কখন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা না হয়, এ বিষয়েও তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন।

এক দিন চলিয়া গেল চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল না। জ্বর যে ভয়ানক, এই জ্বরে যে লক্ষ্মীর জীবন শেষ হইতে পারে, দুই ভাই তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ডাক্তার ডাকিলেই রোগের প্রকৃত অবস্থা ঊর্ধ্বাধিকারকে বলিতে হইবে, নতুবা ঔষধে কোন ফলই হইবে না। কিন্তু প্রকৃত কথা ত প্রকাশ করা কিছুতেই হইতে পারে না; বড় কর্তৃক বলিলেন, "মেয়ে বিনা-চিকিৎসায় মারা যার, তাহাও স্বীকার, কিন্তু এ কলঙ্কের কাহিনী প্রকাশ করিয়া সমাজে হয় ও পতিত হইতে আমি পারিব না।"

নিজেরাই বাহা ভাল মনে করিলেন, এবং বাহা জানিতেন, সেই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা পরদিন করাই স্থির হইল। প্রতিবেশী জ্বীলোকেরা লক্ষ্মীর জরের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন, এবং ডাক্তার ডাকিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন।

দুই দিন গেল, জ্বর কমিল না। এ অবস্থার বিনা চিকিৎসার মেরেকে এমন ভাবে কেলিয়া রাখা অকর্তব্য বলিয়া সকলেই মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর মা বলিলেন, "তিন দিন দেখা বাক, যদি জ্বর না চাড়ে, তা হলে কাজেই ডাক্তার দেখাতে হবে।"

ভগবানের রূপায় তৃতীয় দিনে লক্ষ্মীর জ্বর অনেকটা কম হইল, কিন্তু পেটে অসহ্য বেদনা। টোটকা ঔষধে বিশেষ কোন ফল হইল না। প্রতিবেশিনী একজন জলপড়া জানিতেন। তাহা আনা হইল বটে; কিন্তু লক্ষ্মীকে খাওয়ান হইল না; কারণ যে কারণে পেটে এমন অসহ্য বেদনা হইয়াছে; এ জলপড়ার তাহার কি করিবে? এ দিকে প্রকৃত চিকিৎসার পথও একেবারে বন্ধ। লক্ষ্মী ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিল। বাড়ীর সকলে অন্তোপায় হইয়া তাহার এই কষ্ট, এই বাতনা দেখিতে লাগিলেন; এবং নিজের মনে বাহা আসিল, সেই প্রকার গুণ্ণার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর অদৃষ্টে গুরুতর কষ্ট গভীর বেদনা লেখা আছে; সে এ যন্ত্রণার মরিবে কেন? দুই-তিনদিন কষ্ট পাইবার পর তাহার যন্ত্রণার লাঘব হইল; জ্বরও ছাড়িয়া গেল। কিন্তু শরীর এমন দুর্বল ও অবশ্য বৈ,

সে উঠিয়া বসিতে পারে না। পাঁচ দিনের অন্তর্ধে তাহাকে একেবারে মৃতকর করিয়া ফেলিয়াছিল।

লক্ষ্মীর শরীরের অঙ্গ ছাড়িলে কি হয়, মনের অঙ্গ যে ছাড়ে না; সুধু ছাড়ে না নহে—সে অঙ্গ যে ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যে করদিন সে অজ্ঞান হইয়া ছিল, সে করদিন তাহার পক্ষে ভালই হইয়াছিল; তাহার হৃদয়ের জ্বালা ত সে বুঝিতে পারেনি নাই। এখন জ্ঞান-সম্পাদনের পর হইতে তাহার হৃদয়ে যে তুবানল জলিয়া উঠিল, কিছুতেই ত তাহা নির্দাপিত হয় না; পৃথিবীতে এমন চিকিৎসক নাই—এমন কোন ঔষধ নাই, বাহাতে তাহার জ্বালা দূর করিতে পারে। এক চিকিৎসক; বম; কিন্তু সে ত আসিয়াও কিরিয়া গেল, তাহাকে লইয়া গেল না; আরও কষ্টভোগের অন্ত তাহাকে রাখিয়া গেল। সে বিছানার পড়িয়া সুধুই ভাবে, কি অপরাধে আমার এমন কষ্টের শাস্তি হইল? এ জীবনে এমন কি পাপ করিয়াছি, তাহার ফলে এই নরকভোগ আমার অদৃষ্টে লিখিত হইয়াছিল? বাহারা আমাকে লইয়া গেল, তাহারা মাঝিয়া ফেলিল না কেন? তাহা হইলে ত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।”

এক-একবার ভাবে, কে তাহারা, বাহারা এ সর্বনাশ করিল? সে ত কাহাকেও চিনিতে পারে না। অন্ধকার রাজ্যিতে চোরের মত আসিয়া তাহার জীবনের বাহা সার রহু তাহাই চুরী করিল। কে তাহারা? ওগো স্বরামর, একবার বলিয়া দেও, কে তাহারা? বিধাতা, কুলীন ব্রাহ্মণের ধরে মেরে

করিয়া জন্ম দিলে যদি প্রভু, তবে কুৎসিত করিলে না কেন? রূপ  
 দিলে কেন দয়াময়? এই রূপই যে আমার কাল হইল। আমার  
 যদি রূপ না থাকিত, আমি যদি কুৎসিত হইতাম, তাহা হইলে ত  
 কেহ আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, আমার সৰ্ব্বনাশের জন্ত  
 এমন যড়যন্ত্র করিত না, আমার নারীজন্ম এমন বিফল করিয়া  
 দিত না। আমি ত কিছুই চাহি নাই! আমি ত বিবাহের জন্ত  
 কাতর হই নাই। তোমরা বিশ্বাস কর—ওগো তোমরা বিশ্বাস  
 কর—আমি দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি,—আমি আমার  
 প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা-পিতার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি  
 ঘৌবনের চাকল্য ত একটুও অনুভব করি নাই;—আমি কোন  
 দিন ঋগ্নও সে কথা ভাবি নাই;—আমার হৃদয়ে ত কোন বাসনা  
 জাগে নাই;—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, আমি কখন  
 কোন দিন কাহারও দিকে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহি নাই। গ্রামের  
 কত যুবক—কাহার নাম করিব—কত পায়ও আমার দিকে  
 লোলুপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে; কিন্তু এক দিনের জন্ত,—এক  
 মুহূর্তের জন্তও আমি ত কাহারও দিকে আকৃষ্ট হই নাই। আমি  
 বেশ ছিলাম,—আমি বহু-সংসার লইয়া নীরবে জীবন-পাত করিবার  
 জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি ত কোন দিন ঘৌবনকে  
 আমল দিই নাই;—সংসারের কালকৰ্ম করিতাম; অবসর সময়  
 রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া, বাবার সঙ্গে নানা কথার আলোচনা  
 করিয়া, নানা উপদেশ গ্রহণ করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে সময় কাটাইতে  
 ছিলাম। আমার বিবাহ দিতে না পারিয়া বাবা কাকা মনে কত

কষ্ট করিয়াছেন ; কিন্তু সে কথা একদিনের জন্তও আমার মনে হয়  
 নাই ;—একদিনের জন্তও আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি নাই ।  
 তবে আমার উপর এ গুরুদণ্ড, কঠিন বজ্রাঘাত কেন হইল ?  
 কে বলিয়া দিবে, কোন্ পাপের এ শাস্তি ? আমি কুমারী নই—  
 এখন আমি কুমারী বলিয়া ত মনে করিতে পারিতেছি না । আমি  
 সধবাও নহি—আমি হয় ত বিধবাও নহি । তবে আমি কি ? আমি  
 কিছুই নহি ; আমি মাহুষের বাহিরে গেলাম যে ! বাবা কাকা  
 আমার জন্ত কি কষ্টই না নীরবে সহ করিতেছেন ; মা আমার  
 সর্বদা বিষন্ন, আমার সুখের দিকে চাহিতে পারেন না ;  
 আমার স্নেহময়ী কাকীমা আমার কাছে বসিয়া কাঁদেন ; পাছে  
 কেহ আসিয়া পড়ে, ভয়ে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলেন । কেহ  
 একটা সান্ত্বনার কথাও আমাকে বলেন না,—সবাই চুপ করিয়া  
 গিয়াছেন । এমন করিয়া জীবন যাপন করা যে বড়ই কষ্টকর !  
 কিন্তু কি করিব ? এক পথ,—আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার  
 অবসান করা । আত্মহত্যা ? না, না—তাহা আমি পারিব না ।  
 সে যে মহাপাপ—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । কি পাপে এই  
 কল ভোগ করিতেছি ; তাহার উপর আবার আত্মহত্যা করিয়া  
 আরও মহাপাপ সঞ্চয় করিব । না, তাহা পারিব না । এই যন্ত্রণা  
 এই অন্তর্দাহ নীরবে ভোগ করাই আমার অঙ্গীকার । বাবা বলেন,  
 ‘মা লক্ষ্মী, একটু একটু শাস্ত্রালোচনা কর, শরীর মন ভাল হইবে ।’  
 তা পারি কৈ ? কিছুই ভাল লাগে না—কিছুতেই যে মন  
 যায় না । আমার শরীর যে কলুষিত হইয়াছে,—আমি যে এখন

কিছুই অধিকারী নহি। মা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, ইহার অধিক আমার আর কি দুর্গতি হইতে পারে মা! এইবার দুর্গতি নাশ কর—আমাকে কোলে টানিয়া লও। আমার শরীর অপবিত্র হইয়াছে। কিন্তু তুমি ত জান মা! আমার হৃদয় ত কলুষিত হয় নাই। এক একবার ঐ কথাই ত ভাবি—ঐ কথা ভাবিয়াই ত মনকে প্রবোধ দিতে চাই। ভাবি, দেখ কলুষিত হয়েছে, তাতে কি? আমার হৃদয়ে ত কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আমি ত কুমারী-ধর্ম স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিই নাই—সজ্ঞানে আমি ত আমি কিছু করি নাই। তবে ভাবি কেন? আমি যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। স্বপ্নের মত সে রাত্রির ঘটনা মনে করি না কেন? কিছু, তা যে পারি না,—কিছুতেই পারি না—মন যে প্রবোধ মানে না। থাকিয়া থাকিয়াই মনে হয়—আমি ত সে আমি নই! কিছুতেই যে সে কথা ভাবিতে পারি না—অপ বলিয়া মনে করিতে পারি না। এমন কি কোন ঐশ্বর্য নাই, বাহ্যতে আমার জীবনের ঐ কাল রাত্রির সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া দিতে পারে। না, না, এ স্মৃতি মুছিবার নহে—ইহা আমার আমরণ সঙ্গী থাকিবে। কি যে কষ্ট পাইতেছি—কি নরক-যন্ত্রণা যে ভোগ করিতেছি, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব। কাহাকেও যে বলিব, সে পথও আমার বন্ধ। সে দিনের ঘটনা যে সকলে গোপন করিয়াছে; নতুবা কলকে যে দেশ ভরিয়া যাইবে। কেহ সে কথার উল্লেখ মাত্রও করে না, তাহার কারণ কি আর আমি বুঝিতে পারি না। বাবা যখন আমার বিছানার



বাড়ীতে বাইয়া লক্ষ্মীর অসুখের কথা বলিলেন। মণি কবিরাজ মশাই রোগের বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, "পুরাতন জ্বর, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। আমি এখন আর বাইতে পারিব না, অপরাক্তে বাইয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিব।"

অপরাক্ত চারিটার সময় কবিরাজ মশাই বন্যোপাধ্যায়-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার সুখের জাব দেখিয়া বড় কর্তা ও হরেকৃষ্ণ বেশ বুঝিতে পারিলেন, বহুদশী কবিরাজ মহাশয় রোগ-নির্গম করিতে পারিতেছেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "রামকৃষ্ণ দাদা, লক্ষ্মীর রোগ ত নির্গম করিতে পারিলাম না। আমাদের শাস্ত্রের কোন লক্ষণের সঙ্গেই ত রোগ মিলিতেছে না। নাড়ীতে জ্বরের কোন নিদর্শনই নাই; তবে নাড়ী একটু দুর্বল, আর ত কিছু দেখি না। মা লক্ষ্মীও যা যা বলিল, তাহাতেও কোন কিনারা পাইলাম না। এখন কি ব্যবস্থা করি, তাহাই ত বিষম সমস্যার কথা। কি করিতে কি করিয়া না বলি। আমি বলি কি রামকৃষ্ণ দাদা, ঔষধপত্র কিছু দিয়া কাজ নাই। পথ্যের একটু ব্যবস্থা কর; পুষ্তিকর জ্বব্য বাইতে দেও; চলিতে-ফিরিতে বা কোন শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে দিও না। তাহাতেই হয় ত উপকার হইতে পারে। পাঁচ সাত দিন এই ভাবে চালাইয়া দেখা যাক। তাতে যদি কোন উপকার বোধ না হয়, তখন আবার দেখিয়া বাহা করা যাইবে। তবে

—একেবারে কিছু ঔষধ না দেওয়াও—তাই ত কি করা যায়।—

বাক্, এক কাজ কর। আমি সাত দিনের মত মকরম্বজ দিরা  
বাইতেছি; সুধু মধু অম্লপান দিরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটু  
করিয়া নিও; তাতে শরীরে রক্তসঞ্চার হইবে, দুর্বলতাও হয়  
ত দূর হইতে পারে। আপাততঃ এই রকমই চলুক। কি বল ?”

সাত দিন গেল; মকরম্বজ ব্যবহারে কোন উপকারই দেখা  
গেল না, লক্ষ্মীর দুর্বলতা কমিল না। হরেকৃষ্ণ পুনরায় মদি  
কবিরাজ মশাইয়ের নিকট গেলেন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন

“হরেকৃষ্ণ, রোগই নির্ণয় করিতে পারিলাম না, ঔষধ কি দেব।  
বুধা ঔষধ দেওয়া আমাদের শাস্ত্রের নিবেদ। রোগ বৃদ্ধিতে না  
পারিয়া আন্দাজী ঔষধ দিলে যদি বিপরীত ফল হয়, তাহা হইলে  
রোগীর মৃত্যুর অন্ত চিকিৎসক পাপগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আমি  
জানিয়া-গুনিয়া এমন পাপের কার্য্য আর এ বয়সে করিতে পারিব  
না। তবে এই কথা বলিতে পারি যে, লক্ষ্মীর যে রোগই হইয়া  
থাকুক, তাহা সাংঘাতিক নহে; সুতরাং স্তোমরা চিকিৎসিত হইও  
না। কিছুদিন দেখাই বাক্ না, অন্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পার  
কি না। তখন হয় ত রোগ স্থির করিলেও করা যাইতে পারে।  
‘আপাততঃ কিছুদিন কোন ঔষধই দিরা কাজ নাই।’

তাহাই হইল। লক্ষ্মীর অবস্থা একই ভাবে রহিল; কোন  
উন্নতিও হইল না, বিশেষ অবনতিও স্তোমন দেখা গেল না।

এই ভাবে চারি মাস অতীত হইল। লক্ষ্মীর মা এই চারি মাস  
পরে ‘কিন্তু রোগ ধরিতে পারিলেন। তিনি মাঝার হাত দিরা

বড় গিন্নী তাঁহাকে সাধনা দিরা বলিলেন, "কীদলে কি হবে, ঠাকুর-পো। আমি সারাদিনই কীদছি। এখন কি করা যায়, তাই ঠিক কর। কীদবার সময় অনেক পাবে—জীবন-কালই কীদতে হবে।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "এ বিষয়ে কি কর্তব্য, তা আমরা কি করে বলব। তুমি দাদার কাছে সব কথা বল। তিনি যা বলবেন, তাই করা যাবে। আমি তাঁকে এ কথা কিছুতেই বলতে পারব না।"

বড় গিন্নী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি আর করব। যখন গর্ভে ধরেছি, তখন আমাকেই এ পাণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—আমিই বড়-কর্তাকে বলব।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "কিন্তু বড়-বো এ কথা ঠিক, লক্ষ্মীর কোন অপরাধ নেই। তার অদৃষ্টের দোষ।"

বড়-গিন্নী বলিলেন, "সে কথা কি আর আমি বুঝতে পারছিনে। মেয়ে যদি ইচ্ছে করে কুপথে যেত, তা হ'লে তাকে কি ক্ষমা করবার কথা তোমাকে আমি বলতাম। কিছুতেই না; কিন্তু লক্ষ্মী ত কোন অপকাযই করে নাই; সেই জন্তই ত আমার বুক কেটে যাচ্ছে ঠাকুর-পো! হার না হুর্গা, করিলে না! আমার যে ঐ একমাত্র সন্তান। লক্ষ্মী যে আমার বড় আদরের মেয়ে ঠাকুর-পো। তার অদৃষ্টে এ কি হইল।" বড় গিন্নী আর কথা বলিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতঃকালে হরেকৃষ্ণ যখন শয্যাভ্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন বড় কর্তা বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন ; বলিলেন, “হরি, ব্যাপার শুনেছ ত ?”

হরেকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, পূর্ক রাত্রিতে বড় গিন্নী লক্ষ্মীর কথা দাদাকে বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “শুনেছি।”

“কি করা স্থির করলে ?”

“আমি আর কি বলব ? আপনি যে পরামর্শ দিবেন, তাই করা যাবে।”

বড় কর্তা বলিলেন, “শুনলাম, এই ঘটনার তুমি বড়ই কাতর হয়েছ।”

বড় কর্তা যে ভাবে কথা কহিষ্ঠা বলিলেন, তাহাতে হরেকৃষ্ণ বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। এমন গুরুতর ঘটনা—জাত মান সন্ত্রম নিয়ে কথা, অথচ তাঁহার দাদা এ সংবাদে যে একটুও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার কথার ভাবে এবং তাঁহার আকার-প্রকারে তিনি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এ দিকে তিনি কিন্তু এই চিন্তার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা ঘাইতে পারেন নাই।

হরেকৃষ্ণ দাদার কথার কোন উত্তরই দিগেন না;—তিনি আর কি বলিবেন—চুপ কন্দিয়া থাকিলেন।

তীহাকে নীরব দেখিয়া বড় কর্তা বলিলেন, “হরি, তুমি ছেলে-মাছুষ, তাই এত কাতর হয়েছ। এত কাতর হবার বা চিন্তা করবার বিশেষ কিছু নাই! তুমি আমাদের সমাজের অবস্থা জান না, তোমাকে সে সব কখন জানতেও দিই নাই। এই বয়সে আমি ও-রকম ব্যাপার অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। তুমি শু শোন নাই, দেখ নাই, তোমার ভ্রাতৃবধুও অত-শত জানেন না; তাই তোমরা ভেবে আকুল হয়েছ। ভাই, আমাদের কুলীনের ঘরে এমন হয়ে থাকে; আর তার সহজ ব্যবস্থাও আছে। তুমি এক কাজ কর; ও-পাড়ায় বিণ্ডা-মুচীকে ত জান। তার মাকে একবার বলে এস, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। তার পর যা হয়, সে আমি করব; তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।”

হরেকৃষ্ণের বয়স ৩২ বৎসর। দশবৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়; দাদা ও পিসিমা তীহাকে মাছুষ করেন। রামকৃষ্ণ ছোট ভাইকে অতি ঘেঁরে লালন-পালন করেন; নিজেই ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান। ভাই বাহাতে কোন প্রকার কু-সংসর্গে মিশিতে না পারে, সে দিকে তীহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন ভাবে বর্জিত হইয়া হরেকৃষ্ণ অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়াছিলেন; সুতরাং দাদার কথার কোন মর্মই তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

বড় কর্তা হরেকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াই কথাটা বুঝতে পারিলেন; বলিলেন, “হরি, তুমি আমার কথা মোটেই বুঝতে পার না, তোমার মুখ দেখেই তা জানতে পারা যাচ্ছে। তুমি এত বড় হয়েছ, কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে যে গোপনে কত কি হয়ে থাকে, তার খবরও তুমি রাখ না। আমিই তোমাকে সাবধানে রেখে সে সব জানতে দিই নাই। তাই তুমি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে একটা কথা বলি; এই যে আমাদের কুলীদের ঘরের মেয়েরা কেহ বা চিরজীবন কুমারী থাকিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়, কাহারও বা নামমাত্র বিবাহ হয়; স্বামীর সহিত জীবনে হয় ত কাহারও দ্বিতীয়বার দেখাও হয় না; কাহারও বা সৌভাগ্যক্রমে জীবনের মধ্যে দুই চারিদিন দেখা হয়। এখন বল ত, এই সব মেয়েরা সকলেই কি পবিত্রভাবে জীবন-বাণন করে থাকে? হাঁ, এমন দুশজন আছে, তারা দেবী; তারা প্রকৃতই ব্রহ্মচারিণী ভাবে নিকলক-চরিত্রে জীবন কাটাইয়া যায়; কিন্তু অপরের কি অবস্থা হয়, তা কি কখনও ভেবে দেখেছ? কোন দিন কি সে-দিকে তোমার দৃষ্টি পড়ে নাই?”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “অমি ত কাহাকেও কোন অস্ত্রার ব্যবহার করিতে দেখি নাই, বা শুনি নাই। আমার বিশ্বাস, পবিত্র ব্রহ্মণ-কুলে অন্নগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণ পিতা-মাতার ঔরসে জন্মলাভ করিয়া, কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাই কুপথে যেতে পারে না। অন্ততঃ আমাদের গ্রামে ত এমন দেখি নাই, বা শুনি নাই।”

বড় কৰ্ত্তা বলিলেন, "দেখ নাই, সে তোমার সৌভাগ্য; আর শোন নাই, ভাল কথা; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, বা দেখ নাই, বা শোন নাই, আজ তা দেখতে পেলো: আর আমি, তোমার দাৰা হয়ে সেই কথা তোমাকে শোনাতে বাধ্য হলাম।"

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনার একটু ভয় হয়েছে দাদা। আমাদের লক্ষী ত কুপথগামিনী হয় নাই; কি হয়েছে, তা ত আপনি জানেন।"

বড় কৰ্ত্তা বলিলেন, "আমি লক্ষীর কথা বলছি না। বাণীতে যা দেখতে পেলো, তাতে লক্ষীর কোন অপরাধ নেই। কিন্তু, তোমাকে যদি দৃষ্টান্ত দেখাই, তা হলে তুমি-স্বপ্নার অধোবদন হবে-স্কাই! তা কাজ নেই; পরনিন্দা, পর-কুৎসা তোমার কাণে ঢেলে দিতে চাই না। তবে এই কথা স্নেনে রাখ যে, এই কৌলীন্য-প্রথা যে কি বিবময় ফল দিচ্ছে, তা তুমি বেশ বুঝতে পারছ। যারা আজীবন কুমারী থাকে, বা যারা বিবাহিতা হয়েও কোনদিন স্বামী-সংসর্গ লাভ করতে পারে না, তাদের মধ্যে সকলেই যে নারীধর্ম,—সতীত্ব—রক্ষা করে চলতে পারে, এ কথা মনেও কোরো না; ব্রহ্মমাংসের আশাচার থেকে যে সব মেয়ে এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছে, বা করতে পারে, তারা দেবী; তাদের সতীধর্মের কল্যাণেই আমরা এখনও বেঁচে আছি; কিন্তু সকলেই কি তা পারে? পারে না, স্তত্রায় সমাজের মধ্যে থেকেই, ঘর-গৃহস্থালীর মধ্যে থেকেই কত কু-কার্যের অনুষ্ঠান

করে; আর আমরা আমাদের জাতি-মান-সম্মত বাঁচবার জন্ত  
সে সকল অস্মানবদনে সহ্য করি, গোপন করি। তার ফলে কত  
ক্রমহত্যা হয়ে যায়। কলঙ্ক গোপন করবার জন্ত আর ত পথ  
নাই। এমন ভাবেই আমাদের সমাজ চলে আসছে। তুমি  
ত এ সকলের সংবাদ রাখ না—এতকাল রাখতেও দিই নাই;  
কিন্তু হ্রদৃষ্টক্রমে তোমাকে আজ এ সব কথা বলতে হোলো।  
বর্তমান ক্ষেত্রে তুমি কাতর হয়েছ, আমি হই নাই।  
তুমি পথ জান না, আমার সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।  
সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। এখন বুঝেছ, কেন  
বিষ্ণুর মাকে ডাকতে বললাম। এ সব কাজ সে- করে থাকে।  
তাকে ডেকে আনলেই সে সব ঠিক করে নেবে;—গোপনেই  
এ সব কাজ হয়ে থাকে। তোমার ভ্রাতৃজায়াও তোমারই মত কি  
না; তাই তিনিও তোমারই মত আকুল হয়ে পড়লেন।”

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলিয়া বলিলেন, “এ ছাড়া কি আর পথ  
নেই? এমনই করেই কি, এমন পাপের কাজ করেই কি এত  
কাল আমাদের সমাজ টিকে আছে?”

“হ্যাঁ, তাই আছে ভাই—,কিন্তু আর অধিক দিন টিকবে না;  
এ কঠোর কোলিন্দ্ৰ প্রথার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; তুমি ঠিক বলেছ,  
ঐত পাপ ধর্মে নয় না। কিন্তু তা বলে উপায় নেই। সমাজের  
এ দাসত্ব আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারব না; পার্পা করে  
হোক, অধর্মাচরণ কোরে হোক, বংশমর্যাদা রক্ষা করতেই হবে।  
তার জন্ত আমরা নদী-মায়া, মেহ-ভালবাসা সব ত্যাগ করতে



পারি ;—এত কাল তাই করে এসেছি, পিতৃ-পিতামহেরা করে এসেছেন। যে ভাবেই হোক, যত অধর্মান্বিত করাই হোক, তাঁরা যে বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়াছেন, তা লোপ করতে পারি না। এই বংশমর্যাদা—এই কৌলীন্য-গর্বের কাছে আমরা সব বলি দিতে পারি—দিয়েও আস্ছি। তারই জন্তই এমন কুকার্য্য করতে দ্বিধা বোধ করি না—তাই অম্লানবদনে তোমাকে—আমার দেবচরিত্র ছোট ভাই—তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—কি করতে জান ?—হত্যাকারিণীকে ডেকে আনতে। বাও ভাই, আর পথ নেই—পুরুষ-পরম্পরার বংশগৌরব, কৌলীন্য-মর্যাদা এমন করেই রক্ষা করতে হয়। যারা এমন অবস্থায় পড়েছে, তারা সকলেই তাই করে থাকে।”

“আমি ও ঔষধ খাব না মা! আমি কাকীমার কাছে সব শুনেছি। আমার কাছে আর তোমরা গোপন করছ কেন?”

বড় গিন্নী বলিলেন, “সব যদি শুনে থাক মা, তবে আর ওযুধ খেতে আপত্তি করছ কেন? এ ছাড়া ত আর পথ নেই মা! আমি হতভাগী, তাই মা হয়ে এমন কাজ করতে এসেছি। এর থেকে তুমি বুঝতে পারছ, আর কোন পথ নেই। আমি কি তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি নে; কিন্তু কি করব মা, আর ত উপায় নেই। আমার কথা শোন মা, যত পাপ সব আমার হবে। তোমার ত কোন অপরাধ নেই।”

লক্ষ্মী বলিল, “মা, পূর্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম, তারই এই শাস্তি; তার উপর আরও পাপের বোঝা কেন চাপাও মা!”

মা বলিলেন, “আর কোন পথ থাকলে কি আমি মা হয়ে তোমার মুখে বিষ ঢেলে দিতে এসেছি।”

লক্ষ্মী বলিল “তুমি যাই বল মা, আমি কিছুতেই ও-ঔষধ খাব না। আমি কাল বধন কাকীমার কাছে সব কথা শুনেছি, তখনই মন স্থির করেছি। তোমরা আমাকে মেরে কেলেতে যদি চাও, তাতে আমার আপত্তি নেই; আমার মরণই ভাল। বল, তুমি আমাকে

মেরে কেবলবার জন্ত বিষ এ.নহ, আমি এখনই তা থাকো ; কিন্তু  
 এমন কাজ করো না না। তোমার পায়ে ধরে বলছি, আমাকে  
 বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত তোমরা এমন পাপের কাজে হাত দিও না।  
 আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। তোমরা সমাজের ভয়ে  
 আমাকে এ পাপ কাজ করতে বল, তা আমি বুঝতে পেরেছি ;  
 কিন্তু, আমি সমাজের ভয় করিনে। তোমরা আমাকে বাড়ী থেকে  
 জাড়িয়ে দেও, আমাকে কোথাও ফেলে এস, আমি দ্বারে দ্বারে  
 ভিক্ষা করে খাব, সেও স্বীকার ; কিন্তু এমন পাপের কাজ করতে  
 পারব না, তোমাকেও করতে দেব না।”

মা বলিলেন, “লক্ষ্মী, ভাল করে ভেবে দেখ। তুমি আমার  
 একমাত্র সন্তান এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে মা !  
 তোমাকে কি আমি ছাড়তে পারি। আমার দিকে চেয়ে তোমার  
 বাপ-কাকার কথা মনে করে, আমার কথা শোন।”

লক্ষ্মী বলিল, “মা, আমি কা’ল সারা রাত ভেবেছি। আমার  
 প্রতিজ্ঞা, এমন কাজ কিছুতেই করতে দেব না—কিছুতেই না !  
 তুমি বাবাকে বল, কাকাকে বল ; তাঁরা আমাকে ভাগ করুন,  
 আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।”

মা বলিলেন, “তাতে কি ফল হবে, দেশে-বিদেশে, আক্ষীরবন্ধু  
 সকলের কাছে যে ঠুংদের মাথা হেট হবে ; জাত মান সব বাবে ;  
 লজ্জার যে কেউ মুখ দেখাতে পারবে না ; একঘরে হয়ে থাকতে  
 হবে। তার ফল কি হবে জান, কর্তা তা হলে একদিনও বাঁচবেন  
 না ; আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে হবে ; তারপর তোমার কাকা-

কাকী চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে যাবেন, পথে পথে তিন্স করে থাকবেন ; এই কি 'তার ফল হবে না ?”

লক্ষী বলিল, “ফল বাই হোক মা, তোমরা এমন কাজ কোরো না। তোমাদের মান বাঁচাবার জন্য আমি যে আত্মহত্যা করবার জন্য একদিন প্রস্তুত হয়েছিলাম। কিন্তু আর পাগ করব না ; তাই আত্মহত্যা করতে পারি নাই। আর এখন—এখন ত কিছুতেই মরতে পারিনে মা !”

“তা হ'লে তুমি কি করতে চাও ?”

“তোমরা আর যা বলবে, তাই আমি করব ; বত কষ্ট স্বীকার করতে বলবে, তাতেই আমি সক্ষম ; কিন্তু তোমরা এ পাপের কাজ করতে কিছুতেই পারবে না। যদি জোর করে আমাকে ওয়ুধ খাওয়াতে চাও, তা হলে তোমাদের মান সম্বন্ধ কিছুই থাকেই আমি চাইব না। আমি প্রকৃত কথা দণ্ডজনের কাছে বলে তাদের আশ্রয় ভিক্ষা করব। তাতে তোমাদের যা হয় তাই হবে।”

মা বলিলেন, “তা হ'লে এই কথাই তাঁদের বলি গে।”

“হাঁ, এই কথাই বল গে ; বল গে যে, তাঁদের অভাগী মেয়ে তাঁদের মান-সম্বন্ধ নষ্ট করতে চায় না ; তাঁরা যার কোন উপায়ে আমাকে রক্ষা করুন।”

“আর যে উপায় নাই মা। তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?”

“কেন উপায় থাকবে না। আমাকে বাড়ী থেকে কোন রকমে স্থানান্তরিত করে দেও, এত বড় পৃথিবীতে আমার স্থান

শীরবে অঙ্গমোচন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় দশ-  
মিনিট অতীত হইয়া গেল।

অবশেষে স্বপ্নে অমানুষী বল সংগ্রহ করিয়া দৃঢ়ভাবে বক্তৃতা করিলেন, “হরি, তোমাকে কিছু স্থির করিতে হইবে না। আমিই মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। কি কর্তব্য, আমিই বলিয়া দিতেছি। সন্তান-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া আমি পিতৃপুরুষের গৌরব নষ্ট করিতে পারিব না;—সে অধিকার তোমার-আমার নাই। সমাজের কাছে আত্মবলি দিতেই হইবে—কাক্ষনপুরের বনোপাধ্যায় বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারিব না ভাই! সমাজের চরণে কস্তা-বলিই দিতে হইবে। জগদানন্দ রামচন্দ্র লোকপবাদ-ভয়ে প্রোণ-প্রিয়া জানকীকে নিশ্চলচরিত্রা জানিয়াও বনে বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহা ত জান। সেই হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই রামচন্দ্রের কথা মনে করিয়া আমরাও আমাদের প্রোণ অপেক্ষা প্রিয় এক-মাত্র কন্যাকে বনবাসে দিব;—সমাজের ভয়ে—সমাজের মুখ চাহিয়াই এ কাজ করিতে হইবে। দয়া-মায়া বিসর্জন দিতেই হইবে। সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, পিতৃপিতামহের দেশপূজা বংশে কলঙ্কারোপ করিতে পারি না। সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। সে যখন সমাজের দিকে চাহিবে না, আমাদের মান সম্মানের দিকে চাহিবে না, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করা ব্যতীত পত্যস্তর নাই। মনে করিও না ভাই, সন্ন্যাসীকে আমি ঘোব দিতেছি। সে যাহা বুঝিয়াছে, তাহা ঠিকই বুঝিয়াছে;—পাপে লিপ্ত সে হইতে চাহে না। কিন্তু আমরা ত তাহা পারি

না;—কিছুতেই পারি না। সমাজের ভয়ে লক্ষ্মী পাণের প্রশ্রয় দিতে চাহিতেছে না, একান্ত তাহার উপর রাগ করিতে পারি না;—বরং তাহার প্রশংসাই করিতেছি; কিন্তু আমাদের দ্বয়ে ত সে দৃঢ়তা নাই—আমরা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারি না।”

এতক্ষণ পরে হরেকৃষ্ণ কথা বলিলেন, “তা হোল আপনি এখন কি করিতে বলেন?”

“কি করিতে বলি শুনবে? আমি বলি ক্রণহত্যা করিতে; কিন্তু সে বখন তাতে সম্পূর্ণ অসম্মত, তখন কলিকাতায় লইয়া চিকিৎসা করাইবার কথা প্রকাশ করিয়া, তুমি ও ছোটবোঁরা তাকে নিয়ে কোথাও চলে যাও—আমাদের আর নিয়ে যেতে চেষ্টা না—সে আমরা দুইজন পারব না;—তোমাকেই এ নৃশংস কাজ করতে হবে। তারপর—তারপর তাই হরেকৃষ্ণ, আমার মা লক্ষ্মীকে যেখানে হয়, পথে বসিয়ে রেখে, তোমার বাড়ীতে চলে এস,—প্রকাশ করে দিও লক্ষ্মী আমার মারা গিয়েছে। ইহা ছাড়া আর পথ নেই—তাই পথ নেই। এ কাজ তোমাকেই করতে হবে। ত্রেতাযুগে মহাপুরুষ লক্ষ্মণ তাইয়ের আদেশে সীতাকে বনবাসে দিবে এসেছিলেন; আর কলিযুগে তুমিও আমার লক্ষ্মণ তাই, তুমিও তারই পুনরতিনয় কর। আমার এ আদেশ অমান্য কোরো না। তা যদি না পার, বল, আমরা খ্রীপুরুষে বিষণনে আত্মহত্যা করি, তারপর যা তোমাদের মনে হয়—যা তোমাদের ধর্মে বলে, তাই কোরো।”

হরেকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; এমন স্বদর-

হীন প্রভাবে তাঁহার স্বপ্ন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "যে সমাজ রক্ষার জন্ত, যে মান-সম্মত বাঁচাবার জন্ত এত গর্হিত কাজ করতে হবে, এত মিথ্যা, ছল, প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিতে হবে, সে সমাজ, সে মান-সম্মত কি এতই শূন্যের দাঁড়া!"

"হাঁ, শূন্যের। বতদিন সমাজে বাস করতে চাইবে, ততদিন এই সবই করতে হবে। তুমি একা এক কাজ করছ না, তোমার পূর্বে অনেকে করেছেন—এখনও কতজন করছেন।"

হরেকৃষ্ণ কাতর ভাবে বলিলেন "দাদা, অপরাধ নেবেন না! এতকালের মধ্যে কোন দিন আপনার অবাধ্য হই নাই; এখন যা আদেশ করেছেন, পালন করেছি। কোন দিন আপনি কোন অত্যাচার, অসুচিত আদেশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আজ আপনার এ আদেশ আমার কাছে অত্যাচার, অসম্মত—যদি অপরাধ না নেন, তবে বগি—নৃশংস বলে মনে হচ্ছে। এ আদেশ পালন করতে আমার মন অগ্রসর হচ্ছে না। আপনি এতকাল আমাকে যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, যে উপদেশ দিয়ে এসেছেন, যে কর্তব্য পালন করবার জন্ত আদেশ করেছেন, আপনার আজকার আদেশের সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্য নাই। এমন কঠোর বিধান যে আপনার মত জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ দেবতার মুখ দিয়ে বের হবে, এ কথা আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আপনার সম্মুখে এত কথা আমি কোন দিন বলি নাই; কিন্তু আজ প্রাণের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম। আমি আপনার এ আদেশ পালন করতে একবারে অসম্মত।"

“তা হলে তুমি কি করতে চাও ? তোমাকেই ত কর্তব্য স্থির করতে অস্বরোধ করেছিলাম ; তুমি ত কোন কথাই বলতে পারলে না—কোন পথই দেখিয়ে দিতে পারলে না।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “এতকাল পরামর্শ শুনেই এসেছি, কোন দিন ত পরামর্শ দেবার সাহস বা স্পর্ধা আমার হয় নাই দাদা !”

“কোন দিন ত এমন ঘটনাও উপস্থিত হয় নাই ভাই !” হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনার ব্যয় হইয়াছে ; আমি বলি কি, আপনি বড়বৌ ও লক্ষ্মীকে নিয়ে কাশী-বাস করতে যান। সংসার-ধর্ম্ম ত অনেক করেছেন—এখন কাশীতে যান। সেখানে অস্ত্রাগীকে নিয়ে বাস করুন। সে বিদেশ, সেখানে কে কার খোঁজ নেবে। সেখানে সমাজের ভয় নাই। আপনি সেখানে গিয়ে বাস করুন। একিকে যা রেখে যাবেন, তার থেকে আমি আপনাদের কাশীবাসের খরচ বেশ চালিয়ে নিতে পারব।”

“তারপর।”

“তারপর লক্ষ্মীর কথা বলছেন। লক্ষ্মীকে পাপে ডুবিয়ে কাজ নেই। এই শেষ বরসে এমন মহাপাতকভাগী আপনি হবেন না। এখনও সময় আছে।”

“তারপর।”

“তারপর—তারপর লক্ষ্মী যে এই ভয়ানক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবে, তা আমার বোধ হয় না। তার যে রকম শরীরের



অবস্থা, তাতে শেষ সময়ে খুব সম্ভব তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তখন  
তাকে মা গঙ্গার কোলে কেলে দিবে আপনি নিশ্চিত হবেন।”

“আর তা যদি না হয়।”

“যদি না হয় তখন তাহার উপায় করা যাবে। সে জন্ম  
ভাববেন না। সে ভার আমার উপর রইল। সমাজের মুখ  
চেয়ে পাপের কার্য্য প্রবৃত্ত হতে আমি আপনাকে দেব না।”

বড়-কর্তা অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন ; তাহার পর বলিলেন  
“ভাই হরেকৃষ্ণ, তোমার পরামর্শই ঠিক। অভাগিনীকে নিয়ে  
আমিই বনবাসী হব। তুমি কি মনে করছ ভাই আমার হৃদয়ে  
দয়া মারা নেই। লক্ষ্মী যে আমার কত আদরের কত বড়ের ধন,  
তা কি তুমি জান না। সে যদি কুপথগামিনী হোত, স্বেচ্ছায়  
সে যদি পাপের পথে যেত, তা হলে তাকে আমি দূর করে দিতে  
পারতাম ; কিন্তু তার তো কোন অপরাধ নেই। অসহায় বালিকা  
নিশ্চয়ই প্রাণপনে পাষণ্ডদের হাত থেকে আত্মকক্ষার চেষ্টা  
করেছিল। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। এ সব কথা কি  
আমি বুঝতে পারছি নে। লক্ষ্মীকে পথের ডিখারিণী করবার ”  
পরামর্শ দিতে কি আমার বুক ফেটে যায় নি ভাই। কিন্তু কি  
করব—সমাজের দিকে চেয়ে সব সইতে প্রস্তুত হইছিলাম ; অধর্ম  
কার্য্য করতে অগ্রসর হইছিলাম। এখন ভেঙে দেখলাম, তোমার  
পরামর্শই ঠিক। আমি কাশীবাসীই হব—হতভাগিনী কত্নাকে  
বুকে করে আমি বাবা বিখনাথের চরণেই শরণ দেব। তিনি ত  
অন্তর্য়ামী, তিনি ত সবই দেখতে পাচ্ছেন। আমার লক্ষ্মী যে

প্রকৃতই লক্ষী, তা কি সেই সর্বসাক্ষী বিবেচকের অগোচর রয়েছে।  
 তাঁরই উপর নির্ভর করব। তিনি যা করেন তাই হবে। তুমি  
 আমি কি করতে পারি? ছুইভাই মিলে কি অসহায় বালিকাকে  
 পাষণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম তাই। তাদের  
 হাতে পড়ে লক্ষী আমার যখন বাবা' বলে আশ্রয় তিক্ষা করেছিল,  
 তখন কি সে কাতর আহ্বান শুনতে পেরেছিলাম। বাক সমাজ,  
 বাক সব—আমি লক্ষীকে ত্যাগ করতে পারব না। আমি দেশ  
 ছেড়ে পালিয়ে যাব—সমাজের বাইরে চলে যাব। তুমি ঠিক কথা  
 বলেছ, তোমার উপদেশই ঠিক উপদেশ। তাই হরকৃষ্ণ, এতদিন  
 তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, আমি মোহে অন্ধ হয়ে তা ভুল  
 গিয়েছিলাম। তুমি আজ তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে—  
 তোমার দাদাকে মহাপাতকের হাত থেকে রক্ষা করলে। আমার  
 শিক্ষাদান বুঝা হয় নাই। আশীর্বাদ করি, জীবনান্ত পর্যন্ত  
 এমনই ভাবে বাহা ভায়, বাহা সত্য তুমি তাহার জন্ত বেন বীরের  
 মত দাঁড়াতে পার। অত্যাচার আদেশ—তা স্বয়ং গুরুদেব করলেও,  
 দাদা ত সামান্য মানুষ—তা অস্বীকার করবার মন্ত মনের বল  
 তোমার হয়েছে। এত কষ্টের মধ্যে, এত বিপদের মধ্যে এই  
 কথা মনে করে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা তোমাকে বলে  
 উঠতে পারছি নে। বেশ তুমি আয়োজন কর, ব্যবস্থা কর; দিন  
 কণ আর দেখতে হবে না; যেখানে যা আছে সবই তুমি জান।  
 আরও যদি কিছু জানবার থাকে জেনে নেও, এবং সকলকে বল  
 আমি এই শেষবরসে কাশীবাসী হব।”

৮

পরদিনই গ্রামের সকলে শুনিল যে, শ্রীবৃদ্ধ রামকৃষ্ণ বন্দো-  
পাধ্যায় মহাশয় কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। প্রতিবেশী বৃদ্ধ  
মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সংবাদ পাইবামাত্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়-  
দিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; বড় কৰ্ত্তা ও হরেকৃষ্ণ তখন  
বাড়ীতেই ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “রাম, শুনে বড় সুখী হলাম যে  
তুমি কাশী যাচ্ছ। অতি উত্তম সফল করেছ। আমাদের অদৃষ্টে  
ত নেই, আমাদের এই কাঞ্চনপুরের মাটি ধরেই থাকতে হবে।  
অদৃষ্টে না থাকলে কি হবে বল। এখনও অন্নচিন্তা গেল না।  
মনে করেছিলাম, ছেটেটা বড় হোলো, বা হোক কিঞ্চিৎ পেথা-  
পড়াও শিখল; ছুপয়সা নিয়ে আসবে, সংসারের ভার নেবে।  
সব আশাই বিফল হোগো। কাযকর্ম কিছুট করবে না, সুখ  
পাবে, বেড়াবে, আর বাবুগিরি করবে। আর, সে বাবুগিরির  
পয়সা যে কোথা থেকে আসবে, তা ত ভাবে না। একছু বলবারও  
যো নেই—জান ত রাম, তোমার জেঠীমার স্বভাব,—একটু কিছু  
বলতে গেলেই তিনি একেবারে অগে ওঠেন, বলেন, সাতটা নয়,  
পাঁচটা নয়, ছয়মেয়ের মধ্যে ঐ একটী মাত্র ছেলে, ওকে কিছু বলতে

পারবে না। অমনি করেই ছেলেটার মাথা তিনি খেলেন। আর এই বুড়ো বয়সে কোথায় ঠাকুর-দেবতার নাম করব, তীর্থধর্ম করণ,—না, অন্নচিন্তাতেই দিন কেটে যায়। তা তোমার ও-সব বালাই নেই; লক্ষ্মণের মত ভাই, অমন ছেলে আমাদের এ অঞ্চলেই নেই। তারপর ঐ একটা মেয়ে; একটা দেখে-শুনে বিয়ে দিতে পারলেই আর চাই কি। তা বেশ সফল করেছ। এদিকে তু দেখলে, চেষ্টাও করলে, কোন সুবিধে হোলো না। কাশীতে বাও, সেখানে দেখে-শুনে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর লক্ষ্মীর শরীরও খারাপ হয়েছে; এখানে তু অনেক চিকিৎসাপত্র করালে; কিছুতেই হোলো না। স্থান-পরিবর্তনে ওর শরীরও অমনিই মেয়ে যাবে।”

বড় কর্তী বলিলেন, “সেইজন্যই তু কাকা আরও তাঁড়াতাড়ি করছি; নইলে আরও কিছুদিন পরেই যেতাম।”

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “না না, ও-সব সংকার্য্যে কি দেবী করতে আছে। মনে যখন হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ যখন স্মৃতি দিয়েছেন, তখন আর কাণবিলম্ব করো না—গুভস্ত শীঘ্রম্।”

বড় কর্তী বলিলেন, “কাকা, হরেকৃষ্ণ ছেলেমানুষ; বয়স ৩২ বছর হলে কি হয়, এখনও ওকে আমি ছেলেমানুষ মনে করি। ওকে সর্ব্বদা দেখবেন; আপনার উপর ওর ভার দিয়ে গেলাম।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “সেজন্য তুমি ভেব না রাম, এই ত এতদিন দেখে আসছি, হরেকৃষ্ণই ত ইদানী সবই করছে। জমি-জমা দেখাশুনো, শিষ্টযজমান রক্ষা—সে সবই ত এখন হরেকৃষ্ণই

করে, তুমি আর কত দেখতে পার। সে সব ঠিক হয়ে যাবে।  
আমরা আছি; বিপদ-আপদে সবাই বুক দিয়ে পড়ব। তুমি শু  
আর কিছুই অসম্ভাব রেখে যাচ্ না। যা জমিজমা আছে, তাতে  
বেশ চলে যায়, তা ছাড়া শিষ্যজমানও ত কম নেই;—  
তোমার অভাব কি বল ?”

বড় কর্তা বলিলেন, “এই আশীর্বাদ করবেন, হরেকৃষ্ণ যেন  
সব চালিয়ে নিতে পারে। ঘরে ত আর দুশ পাঁচশ মজুত নেই;  
আপনদের আশীর্বাদে কোন রকমে দিন চলে যায়, এইমাত্র।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “কাশীতে তোমাদের তিনটি  
মানুষের খরচও ত নিতান্ত পক্ষে মাসে ত্রিশটাকার কম হবে না।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “হাঁ মাসে ত্রিশটাকা করেই পাঠিয়ে দেব  
স্থির করেছি।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “তা সে আর বেশী কি ? তোমা-  
দের যে সব শিষ্য আছে, তাদের মধ্যে এমনও দুই চার জন  
আছেন, যারা আনন্দের সঙ্গে এই কাশীবাসের খরচ দিতে রাজী  
হবেন। তুমি যে কাশী যাবার ইচ্ছে করেছ, এ সংবাদ শিষ্যদের  
জানানো উচিত।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “সে কথা আমিও ভেবেছি। আজই  
সকলকে চিঠি লিখিব; নইলে তারা মনে কষ্ট করবে।”

বড় কর্তা বলিলেন, “সকলকেই একবার আসতে লিখে দিও।  
যাবার সময় সকলকেই আশীর্বাদ করে যেতে হবে; তারা  
আমাকে বড়ই ভক্তি করে।”

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, “তুমি ত আর পেশাদার গুরুগিরি  
কর না, তুমি শিষ্যদের যথেষ্ট ভালবাস, তাদের মঙ্গলকামনা  
কর; তাই তারা তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। এখন যে সব গুরু  
দেখতে পাও, জান হরেকৃষ্ণ, তারা লেখাপড়া জানে না, শাস্ত্রজ্ঞান  
ত মোটেই নেই, অনেকে এমন ছশ্চরিত্র যে তাদের নাম মনে  
হলেও ঘৃণা হয়, এদিকে শিষ্যের কাছ থেকে পরমা আদারের  
কিকির খুব জানে। তাতেই ত এখনকার শিষ্যদের গুরুভক্তিও  
কমে যাচ্ছে। তুমি ত তেমন নও।”

বড় বর্তী বলিলেন, “আমি এ জীবনে কখন কোন শিষ্যের  
কাছে কিছু চাই নাই; যে যা দেয়, তাই হাসিমুখে নিই। এই  
সেবার গোলক কবরের মাতৃপ্রাঙ্কে গেলাম। গোলাকের অবস্থা  
বেশ ভাল, খুব ঘটা করে শ্রদ্ধা করল। পুরোহিত ও অন্নাত  
ব্রাহ্মণেরা এমন ব্যবহার করতে লাগল যে, দেখে আমার লজ্জা  
হোতে লাগল;—সুধু দেও, আরও দেও,—আর এটা ভাল হয়  
নাই, ওটা ভাল হয় নাই, বলে বিরক্তি প্রকাশ। এতে শিষ্য-  
বজ্রমানের আর ভক্তি থাকে কি করে? এই পুরোহিত আবার  
এমনই নির্লজ্জ, যে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগল, আমি যেন  
সব বেশী বেশী করে দিতে বলি। তা, কাকা, আপনার আশীর্বাদে  
অত লোভ আমার নেই; আমি বরঞ্চ তাদের নিরস্ত করতে  
লাগলাম। গোলক যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এত দিল, পুরো-  
হিতকে বধাতিরিক্ত দিল, তবু তাদের মন উঠল না। আর  
আমাকে যা দিল, আমি তাই যথেষ্ট বলে হাসিমুখে গ্রহণ করলাম।

দেখ, হরি, গোলোক করকে ভাল করে একখানা চিঠি লিখে দিও, সে যেন অবশ্য অবশ্য একবার দেখা করে যায়। তার উপর অনেক ভার দিয়ে যেতে হবে।”

যখন এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, তখন আরও দুই চারি জন গ্রামস্থ লোক আসিলেন। স্বরূপ চক্রবর্তী বলিলেন, “রাম দাদা, তুমি সত্যই কাশী চললে। আর কিছুদিন পরে গেলেই হোতো। গ্রামের অবস্থা ত দেখুছ; তোমরা হুঁচারজন আছ, তাই এখনও গ্রামের শ্রী আছে। তা তুমি কি একেবারে বাস করবার জন্যই যাচ্ছ, না তীর্থ করেই কিরে আসবে। মেয়েটার বিবাহ শেষ করে, একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলেই পারতে।”

বড় ‘কর্তা’ বলিলেন “সে বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছে; তিনি যদি দয়া করে স্থান দেন, তা হলে ঐ চরণ-তলেই পড়ে থাকব। মেয়ের বিয়ের ত কোন কিছুই করে উঠতে পারলাম না; তাই তাকে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি; দেখি কাশীতে যদি কিছু করতে পারি।”

স্বরূপ বলিলেন, “তা হলে দাদীকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ; আমি মনে করেছিলাম, তাকে রেখে বাবে।”

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “একলা বৌমা কি করে বাবেন, মেয়েটা কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হবে, তারাম-ব্যারাম আছে ত।”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “লক্ষ্মীর শরীর বড় খারাপ হয়েছে, ডাক্তার কবিরাজ ত কিছুই করতে পারল না; তাঁরা বললেন স্থান

পরিবর্তনে শরীর ভাল হতে পারে; সেই জন্যই দামাকে ডাক্তার-  
ডাক্তি কাশী বেতে হচ্ছে।”

কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা সকলেই অনুমোদন করিলেন, ইহাতে হরেকৃষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিলেন; প্রকৃত কারণ সত্বে কাহারও মনে যে সামান্য সন্দেহেরও উদ্রেক হয় নাই, ইহাতেই তিনি আশস্ত হইলেন। তাহার পর প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরাও যে এ বিষয়ে কোন প্রকার বাদানুবাদ করিলেন না, ইহাও পরম সৌভাগ্য বলিয়া হরেকৃষ্ণ নিশ্চিত হইলেন। পুরুষদের সত্বে তাঁহার তত ভয়ের কারণ ছিল না; কিন্তু পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা বড় সহজে, ভাল ভাবে কোন কথা গ্রহণ করেন না; পাছে তাঁহারা লক্ষীর অবস্থা সত্বে কোন সন্দেহ করিয়া এই হঠাৎ কাশী যাওয়ার কথা লইয়া একটা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বসেন, এই ভয়ই হরেকৃষ্ণের মনে প্রধান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা না দেখিয়া তিনি আপাততঃ শাস্তি বোধ করিলেন। তাহার পর;—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরেকৃষ্ণ মনে মনে বলিলেন, “তাহার পর যাহা অদৃষ্ট থাকে তাহাই হইবে। হার অভাগী লক্ষ্মী! কোন্ প্রাণে তোকে চিরদিনের জন্য বিদায় দেব মা! বাবা বিশ্বনাথ! লক্ষ্মীকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর! তাকে যেন আবার ঘরে ফিরে আনতে পারি।” কিন্তু কেমন করিয়া সে আশা সফল হইবে, তাহা চিন্তা করিয়াও তাঁহার হৃদকম্প হইল।

সেই দিনই শিষ্যদিগকে পত্র লেখা হইল; কাশী যাওয়ার দিন স্থিরও হইয়া গেল। তিন চারিদিন পরেই অনেক শিষ্য আসিয়া



উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ বা কার্যানুরোধে আসিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বধ্যশক্তি প্রণামী পাঠাইয়া দিলেন। যাহারা আসিলেন, তাঁহারাও বধেষ্ট প্রণামী দিলেন। গোলোক কর সংবাদ পাওনামাত্রই গুরু-পদ দর্শন করিবার জন্য সর্ব্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া আসিলেন এবং আরও কিছুদিন কাশী যাওয়া বন্ধ রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, আমারও বয়স হয়েছে। এতদিন ত বিষয় নিয়েই কাটালাম; এখন আমারও ইচ্ছা যে বাকী কয়েকটা দিন কাশীতেই কাটাবো। কিন্তু আপাততঃ যাওয়ার অনেক বিঘ্ন। বিষয়-আশয় কাজকর্মের একটা বিলি-বাবস্থা করা ত চাই। ছেলে দুইটাকে ত এতদিন বা হয় লেখাপড়া শিখালাম, এখন কিছুদিন কাছে বসিয়ে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে, দিয়ে না গেলে, তারা কি এসকল রক্ষা করতে পারবে। আপনি আর বছরখানেক অপেক্ষা করুন; তা হলেই আমিও আপনার সঙ্গে হতে পারব, এবং শেষ কালটা বিশ্বনাথ দর্শন করে আর আপনাদের সেবা করে জীবন সার্থক করতে পারব।"

বড় কঠী বলিলেন "তা ত হয় না গোলোক! মনে এখন বাসনা হয়েছে, বাবা বিশ্বনাথ বখন দয়া করেছেন, তখন আর বিলম্ব করা যায় না। কিছুই ত বলা যায় না, মন না গতি। কখন কি মন হয়, তা কি কেউ বলতে পারে।"

গোলোক বলিলেন "সে কথা ঠিক বলেছেন ঠাকুর মহাশয়! তবে কি জানেন, ছোটঠাকুর মহাশয় ত আর এ সব ছেড়ে,

আমাদের ছেড়ে, আপনাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না। বিশেষ  
সেবার কষ্ট হবে। আমরা যদি সঙ্গে থাকি, তা হলে সেবা যাতে  
হয়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে পারতাম। এই যা আপত্তি।”

“না গোলোক, তুমি সে আপত্তি কোরো না। দেখ, তোমাকে  
বিশেষ করে আস্তে লিখেছিলেন কেন জান? আমার শিষ্যদের  
মধ্যে তুমিই ভগবানের আশীর্বাদে ভাগ্যবান হয়েছ। হরেকৃষ্ণ  
এখনও সংসারের কিছুই জানে না; দাদার আড়ালে থেকেই সে  
এতদিন কাটিয়েছে। তাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করে  
যাচ্ছি। তুমি সর্বদা তার উপর দৃষ্টি রেখো; বিপদে-আপদে  
মাথা দিয়ে দাঁড়িও; তার যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে তোমাকেই  
দেখতে হবে। যাতে তার সব দিকে ভাল হয়, তা তোমাকেই  
করতে হবে। সে যাতে সব ভার বহিতে পারে, তার উপযুক্ত  
তাকে করে দিতে হবে। আর—”

গোলোক বাধাদিয়া বলিলেন, “ঠাকুর মহাশয়, এ সংসার  
ছোট-ঠাকুর মহাশয় একা বহিবেন কি করে? আমাকেও ত  
সংসারের কিছু ভার দিলে পারতেন।”

বড় কঠা হাসিয়া বলিলেন, “তোমার উপর যে গুরুতর ভার  
দিয়ে যাচ্ছি গোলোক! তোমার গুরুবংশের মান-সম্মান, ভরণ-  
পোষণ সমস্ত ভারই যে তোমার উপর রইল।”

“না, ঠাকুর মহাশয়, আপনি ত কোন ভারই আমাকে দিলেন  
না। এই ত এতকাল দেখে আসছি; কোন দিন ত এ কথা  
বলতে শুনলাম না, ‘গোলোক, আমার এই অর্জাব হয়েছে, তুমি

তার ব্যবস্থা কর'। কৈ, এমন কথা ত আপনি একবারও বলেন নাই। ছোট্টাকুর মহাশয় আপনারই ভাই। তিনিও কিছু বলবেন না, বা জানাবেন না, এ আমি ঠিক জানি। সেবার আমার স্ত্রী এসে নূতন একটা কোঠা করে দেবার জন্ত কত অনুরোধ করলেন; আপনি বললেন, 'যা আছে, তাতেই বেশ চলে যাচ্ছে, আর কোঠা কেন? হরেকৃষ্ণের ছেলেপিলে হলে যখন স্থানের অকুলন হবে, তখন করে দিও।' কেমন, এই ত আপনার কথা। তা হলে আর প্রকৃত ভায় কি দিলেন। যাক্ সে কথা; আমি বলি কি, এই যাওয়ার যা খরচ—এটা ছোট্টাকুর মহাশয় দিতে পারবেন না, আমি দেব। আর মাসে-মাসে কানীতে যে খরচ হবে, তাও আমাকে দেবার অনুমতি করে যান। ছোট্টাকুর মহাশয়ের উপর এত ভার চাপাবেন না।"

বড় কর্তা বলিলেন, "গোলোক, তুমি যা বলছ, সে তোমারই মত লোকের উপযুক্ত কথা; কিন্তু তোমাদের কল্যাণে, তোমাদেরই জঙ্কির জোরে, হরেকৃষ্ণ অন্যায়সে এ সব করতে পারবে। তুমি ভেবে দেখ, আমরা চাকরী করি না;—তোমরা যা দেও, তাতেই চলে। হরেকৃষ্ণ মা দেবে, সে কি ভার টাকা, না সে তোমাদেরই দত্ত টাকা। তবে আর পৃথক করে দিতে চাইছ কেন? এই এখনই ত বলেছি, হরেকৃষ্ণের উন্নতির ভার তোমাদের উপর দিয়ে যাচ্ছি। পাথের দিতে চাইছ। আমার অল্প শিল্পেরা এসেছিলেন, এই রামকুমার দত্ত, শিরোমণি বসু, রসিক পাল তোমারই পাশে বসে আছে। এদের অবস্থা তোমার মত না হ'লেও বেশ সম্বল।

এরাও আমার শিষ্য ; এরাও আমার তার নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমি কাকে রেখে কার কাছে চাইব। তুমি বিশেষ সম্পন্ন, তাই তোমার উপর বড় ভার দিলাম ; এরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, এরা প্রাণ দিয়ে হরেকৃষ্ণের কাজ করবে। এরা সবাই যে প্রশাসী দিয়েছে, আরও দেবে বলে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তা কম নয় ; তাতে আমার পাথের কেন, অনেক দিনের খরচ চলে যাবে। সুতরাং সেজন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না।”

গোলোক হরেকৃষ্ণের দিকে চাখিয়া বলিলেন, “ছোটঠাকুর মহাশয়, কান্দীর খরচ মাসে কত করে স্থির করলেন ?”

হরেকৃষ্ণ বলিলেন, “মাসে ত্রিশটাকা হিসাবে দিতে হবে।”

গোলোক বলিলেন, “মাসে ত্রিশটাকা ; তা হলে হোগো বছরে তিনশত বাট টাকা ;—ধরা যাক, বছরে চারশত টাকা। দেখুন ছোটঠাকুর মহাশয়, মাহুঘের শরীরের কথা বলা যায় না। এই আমি আছি, দশদিন পরেই হয় ত মারা যেতে পারি, কেমন ? তার পর ছিলে-পিলেরা থাকবে ;—তাদের কার কেমন মতি হবে, তারই বা ঠিকানা কি ? আমি বলি কি, আমি কালই বাড়ী গিয়ে ঠাকুর মহাশয়ের তিন বছরের খরচ তিন-চেরে বারশত টাকা আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। আপনি সেই টাকাটা ডাকঘরে জমা রাখিবেন। তার থেকে মাসে-মাসে ঠাকুর মহাশয়ের খরচ পাঠিয়ে দেবেন। তার বাড়ী যা লাগবে, তা এই রামকুমার দা আছেন, ঐ বোস মশাই আছেন, আরও অনেকে আছেন,—সকলকেই ত আমি জানি,—এঁরা দেবেন। তাঁদের শুকসেবা

থেকে আমি বঞ্চিত করব কেন? আমার না হয় দুটো পরসী আছে; কিন্তু ভক্তিতে এঁরা আমার চাইতে কম নন। কি বলেন? দাদার দিকে চাইতে হবে না। শুঁকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। স্বর্গীয় গুরুঠাকুর (গোলোক তাঁহার উদ্দেশ্যে কর-  
 বোড়ে প্রণাম করিলেন) যখন শুঁকে নিয়ে আমাদের বাড়ী পদধূলি দিতেন, তখন উনি এই আঠারো উনিশ বছরের ছেলে; আমার বয়স তখন আর কত—এই তেইশ চব্বিশ! তখন থেকেই দেখে আসছি, শুঁর লোভ বলে কিছুই নেই। আর এতকাল তাই দেখ-  
 লাম। ঐ পায়ের ধূলোর জোরেই ত গোলোক কর পাঁচ টাকার মুহুরিগিরি থেকে এত বিষয়-আশয় করেছে। শুঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। উনি ত সব মারা কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন; এখন আপনাতে আমাতে কথা, কি বল রামকুমার দাদা!”

রামকুমার দত্ত বলিলেন, “দে ত ঠিক কথা।”

শিরোমণি বহু বলিলেন, “করমশাই, ছোটঠাকুর আবার বড় ঠাকুর মশাইয়ের বাড়ী। শুন্বেন শুঁর কীর্তির কথা, এই বছর তিনেক আগে একবার উনি আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়েছিলেন। আমি মনে করলাম, কালপুত্র আছে, পুত্র-পুত্রবধূর মত নেওরাটা সেরে নিই। তারই আয়োজন করব। অবস্থা ত ভাল নয়; কোন রকমে কাজ শেষ করলাম। দিলাম অতি সামান্যই; এই খান-তের চোদ্দ ছোটবড়, অতি কম দামের কাপড়; বাসনপত্রও তেমনি; আর প্রণামী বুঝি গোটা ত্রিশেক টাকা। উনি তাতেই মহা সন্তুষ্ট। আরও অনেকের গুরু ত

দেখেছি। ওরে বাবা, কি তেজ, কিছুই তাঁদের মনে ধরে না।  
 যাক সে কথা। ফিরবার পূর্বদিন রাত্রে বললেন, কাল সকালে  
 আহারান্তেই যাত্রা করব। তাই ঠিক হলো। সকালে সন্দের  
 লোকটীকে জিন্‌ষপত্রগুলো বুঝিয়ে বেঁধে-ছেঁদে দিলাম। উনি  
 প্রাতঃকালে গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্নে এসে  
 বললেন 'বোস-দাদা, আজ আর আমার যাওয়া হবে না, কাল খুব  
 ভোরে যাব।' শুনে আমি খুবই যত্নে হলাম। বিকেল বেলা  
 দেখি, সন্দের লোকটির মাথার কাপড়ের মোট দিয়ে ঠাকুর  
 বাইরে যাচ্ছেন। আমি বললাম 'ও ঠাকুরভাই, এই না বললেন,  
 কা'ল সকালে যাবো, আবার এখনই না ব'লে-করে যে চলেছেন।'।  
 উনি হেসেই বাছেন 'না, যাচ্ছিনে, 'একটু বেড়িয়ে আসি।' আমি  
 বললাম 'বেড়াতে যাবেন, তাতে কাপড়ের মোট সঙ্গে কেন?'  
 উনি বললেন 'একটু দরকার আছে।' দরকারটা কি, তাই  
 দেখবার উদ্দেশ্যে আমিও সঙ্গে নিলাম। আমাদের গাঁয়ের পশ্চিম  
 পাড়ার অনেক দুঃখী লোকের বাস; তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা  
 শুনে এসেছিলেন। সেখানে গিয়ে করলেন কি, সকলকে ডেকে  
 'কাশড়গুলো বিলিয়ে দিলেন; আর সঙ্গে যে টাকা ছিল, সব দিয়ে  
 বাড়ী ফিরে এলেন। আমি ত অবাক।"

রসিক শাল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি  
 বলিলেন, "উনি ব'লে নয় এ বাড়ীর সবাই সমান। সেবার আমার  
 স্ত্রী এখানে এসেছিলেন। তিনি গিয়ে গল্প করলেন যে, বড়ঠাকুর  
 মশাই ত কিছুই দেখেন না; ছোটঠাকুর মশাই আর বড়

মাঠাকরণই সব করেন। যেমন ছোটঠাকুর মশাই, তেমনি মাঠাকরণ, আবার তেমনি মেয়েটী। বরে কিছু থাকবার যো নেই। আমার স্ত্রী বললেন, গরীব-দুঃখীর উপর তাঁদের কি দয়া! তাইতেই ত কিছু জমে না, সব খরচ হয়ে যায়।”

বড় কর্তা সহাস্তে বলিলেন, “জমে না কি রসিক! এই যে সৰ তোমরা জমেছ; তোমরা এক-একজন যে আমার লাখটাকার সম্পত্তি। আমি এর চাইতে বেশী কি জমাব? দরকার কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, হরেকৃষ্ণ যেন এমনই করেই দিন কাটাতে পারে।”

গোলোক কর বলিলেন, “তা হলে আমি সামান্য বা কিছু এনেছি, তা আর ঠাকুর মশাইকে প্রণামী দেব না, অমনিই আশীর্বাদ নিরে যাব। আমি বড়-মাঠাকরণকে, আর লক্ষীকেই প্রণামী দিয়ে যাই।”

গোলোক কর এবং আরও দুই একজন বড় কর্তার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পরদিন চলিয়া গেলেন; দুই তিনজন ঠাকুর মহাশয়ের যাত্রার দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাইবেন বলিলেন।

কাশী-যাত্রার দিন নিকট ~~হইতে~~ লাগিল। গোলোক কর  
 বাড়ীতে পৌছিয়াই বারশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। হরে-  
 কৃষ্ণ তাহার মধ্য হইতে হাজার টাকা পোষ্টাকিসে জমা দিয়াছেন,  
 বাকী দুইশত টাকা হাতে রাখিলেন; অভিশ্রম এই যে, এই  
 টাকাটা তিনি বড় বোয়ের হাতে গোপনে রাখিয়া দিবেন—  
 বিশেষে হঠাৎ যদি কোন দরকার হয়, বা কোন বিপদ উপস্থিত  
 হয়, তাহা হইলে এই টাকা কাজে লাগিতে পারে। অন্য শিল্প-  
 দের নিকট বাহা প্রণামী পাঠয়াছিলেন, তাহাও হিসাব করিয়া  
 দেখিলেন, নিতান্ত কম নহে—প্রায় সাড়ে তিন শত টাকা।  
 হরেকৃষ্ণ এই টাকা হইতে দুইশত টাকা প্রাণের রাখব গোদারের  
 দোকানে জমা রাখিলেন—গোলোক করের টাকাটা সমস্তই  
 দাদার খরচের জন্যই রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য। পোষ্ট-আকিস  
 হইতে টাকা তুলিতে গেলে দশদিন বিলম্বও হইতে পারে;  
 রাখব গোদারের কাছে কিছু টাকা থাকিলে, যখন দরকার হইবে,  
 তুলিয়া লওয়া সহজ। দাদার পথ-খরচের জন্য দেড় শত টাকাই  
 আপাততঃ বঞ্চেট;—আর যদি কমই পড়ে, তাহা হইলেও বড়-  
 বোয়ের নিকট ত টাকা থাকিল।



এদিকে যাত্রার সমস্ত আয়োজনই চলিতে লাগিল। হরেকৃষ্ণ দাদার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হোট বধুকে কয়েক-দিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া, তিনিও দাদার সঙ্গী হন। দাদাকে কানী পৌছাইয়া দিয়া, সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার দাদা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; তিনি বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ, তুমি শু কখন ও-সব দেশে যাও নাই; তুমি আর বিশেষ কি সাহায্য করবে; বিশেষতঃ বাড়ীতে নারায়ণ আছেন। অন্যের উপর তাঁহার সেবার ভার দিয়া যাওয়া আমি ভাল মনে করি না— সেবাপত্রাধ বড় গুরুতর অপরাধ।” সুতরাং হরেকৃষ্ণের দাদার সঙ্গী হওয়া হইল না। তিনি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত দাদার বাহা কিছু দরকার হইতে পারে, তাঁহার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

বড় গিন্নী কেমন যেন হইয়া গেলেন; তাঁহার আর হাত-পা উঠে না; সদস্ত কার্যেই তাঁহার কেমন একটা উদাসীন ভাব। এ যে তীর্থযাত্রা নহে,—এ যে বিশ্বনাথ দর্শনের বাসনা নহে,—এ যে বনবাস—এ যে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার চিরজীবনের জন্য বিসর্জনের ব্যবস্থা, তাহা কি তিনি ভুলিতে পারেন? কৃষ্ণভক্তের গর্ভে কি আছে, তাহাই ভাবিয়া তিনি হাকুল হইয়া পড়িলেন। কোথাও, কোন্ নির্কীৰ্ত্তব স্থানে বাইতেছেন,— সঙ্গে তাঁহার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, দক্ষিণ হস্ত হরেকৃষ্ণ থাকিবেন না,—কেমন করিয়া কি করিবেন, এই ভাবিয়াই তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন।

যাত্রার পূর্কদিন রাত্ৰিতে ছোট-বৌ লক্ষ্মীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ছোট-বৌয়ের বয়স এই একুশ বৎসর। লক্ষ্মীকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। লক্ষ্মী তাঁহার কল্পাস্থানীয়া হইলেও বয়সের বিশেষ তারতম্য না থাকায়, দুইজনে সখীর ভাবে এককাল কাটাইয়াছেন। ছোটবধু বেশ লেখাপড়া জানিতেন; তাঁহার পিতা বিক্রমপুর অঞ্চলের একজন প্রধান অধ্যাপক।

ছোট-বৌ লক্ষ্মীর পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মী, আমাদের ছেড়ে চললে মা! এ জীবনে আর কি তোমাকে দেখতে পাব। তোমাদের ছেড়ে কি করে যে থাকিব, তাই ভাবছি, আর কাজ পাচ্ছে। এমন সর্বনাশ কে করলে? আমাদের এমন সুখের সংসারে কে এ আশুনি ছেলে দিলে? আর কি কোন উপায় ছিল না, মা-লক্ষ্মী!”

লক্ষ্মী বলিল, “কাকীমা, সবই ত তুমি জান; তোমার কাছে ত কিছুই গোপন করি নাই। বাবা কাকা যা করতে চেয়েছিলেন, তাতে বাধা দিয়ে কি আমি অন্তর কাজ করেছি কাকীমা?”

“না, তুমি কোন অন্তর কাজ কর নাই। কিন্তু সব যে গেল। তোমাকে যে জন্মের মত হারাতে হোলো।”

“এ ছাড়া আর পথ নেই। আমি অনেক ভেবেই এ পথ ধরেছি। শোন কাকীমা, মন খুলে কথা বলবার লোক আর আমি পাব না; তুমিই আমার ব্যথা বোঝ কাকীমা, তোমাকেই

বলি। আমি এতদিন ধরে কত কথা ভেবেছি। দেখ, আমি আর কুমারী নই, সধবাও নই,—বিবাহ ত আমার হয় নাই,—অথচ আমার মনে হয় আমি বিধবা। আমি চির-জীবন এই বৈধব্যই পালন করব। আমি কাহারও ধর্মপত্নী নই,—কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী নই। তুমি পণ্ডিতের মেয়ে, তুমি শাস্ত্র জান;—তুমিই বল আমার অবস্থা কি? আমি জেনে রেখেছি, আমি একজনের পত্নী—এক রাজির সামান্ত সময়ের জন্য আমি একজনের কাম-পত্নী হয়েছিলাম;—ইচ্ছার হই নাই—সজ্ঞানে হই নাই—অজ্ঞান অবস্থায় একজনের কাম-পত্নীর কাজ আমাকে করতে হয়েছে। তাহার পরফলেই আমি বিধবা হয়েছি। শাস্ত্রে কি বলে জানিনে; কিন্তু এই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। আমি চির-জীবন এই বৈধব্য পালন করব;—এ জীবনে আমি পরপুরুষের চিন্তা কোনদিন মনে আনি নাই;—আর আনিবও না। আমার গর্ভে যে এসেছে, সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তাকে রক্ষা করতে আমি বাধ্য। যে ইহার জন্মদাতা, তাকে চিন্তে পারি নাই—জানতে পারি নাই। কতজনের কথা মনে করেছি,—কতজনকে এই সন্তানের জন্মদাতা বলে সন্দেহ করে পাপ-ভাগিনী হয়েছি। কি করে চিন্তা বল কাকীয়া।—তা, না চিন্তালাম, না জানালাম, না পরিচয় পেলাম;—কিন্তু একরাজির জন্ত,—কয়েক ঘণ্টার জন্ত—জানি না, হয় ত কয়েক মূহূর্তের জন্ত, একজনের কাম-পত্নী হয়েছিলাম, এ কথা ত ঠিক। অজ্ঞানেই হোক না কেন, একজনের কাছে ত দেহ দিতে হয়েছিল। তারই

কল এই সন্তান। ভাকে আমি বধ করবার অধিকারী নই—  
 কিছুতেই নয়। সেইজন্যই আমি লজ্জা-সরম ভ্যাগ করে, এই  
 পাপকার্যে সশ্রুতি দিই নাই। আমি ত কাকীমা, ধর্মদ্রষ্ট হই  
 নাই, আমি ত খেচ্ছার কারও সেবা করি নাই;—আমি কামনা-  
 বাসনার দাসীও করি নাই। আমি কাকীমা, কলঙ্কিনী নহি।  
 সমাজ বা বলুক—লোকে বা বলুক, আমি ত আমার নারীধর্ম  
 বিসর্জন দিই নাই;—আমার গর্ভের সন্তান ত আমার কলঙ্কের  
 সাক্ষ্য নয় কাকীমা। আমি মনে-প্রাণে কাহারও ধর্মপত্নী নহি;  
 এ জীবনে আমি আর সে বাসনা রাখি না। সেই রাজির পরেই  
 আমি চির-বৈধবা-ব্রত গ্রহণ করেছি। আর তোমাকেই জিজ্ঞাসা  
 করি, সমাজ আমাকে কি বলে অপরাধিনী করতে পারে?  
 হিংস্র কল্পতে আমাকে আক্রমণ করে, আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত  
 করেছিল,—ভাতে কে আমাকে অপরাধিনী করতে পারে? আমি  
 তখন অসহায়;—আমার তখন আত্মরক্ষার শক্তি-সামর্থ্য ছিল  
 না,—আমি তখন তরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। ইহার মধ্যে  
 আমার অপরাধ কোথায়? তবে তার জন্য আমার উপর তোমরা  
 কঠিন দণ্ড দিতে চাও কেন? আমি সে দণ্ড মাথা পেতে নিতে  
 'যাব কেন? পূর্বজন্মের পাপের কণে আমার আজ এই দশা  
 হোলো। আমার তাকে বাড়াতে যাব কেন? সমাজের কথা  
 বলবে। তুমি সমাজের সকলকে ডেকে আন,—আমি মুক্তকণ্ঠে  
 আমার কাহিনী তাঁদের কাছে বলতে পরি। তারপর, তাঁরা  
 বিচার করুন। তাঁরা বলুন, কোন্‌খানে আমার অপরাধ? তবে

আমি আরও পাণের বোঝা মাথায় করতে বাব কেন ? আমি  
 ত কোন পাণের কাজ করি নাই। লজ্জা দ্বিতে হয়, তাকে দেও,  
 যে আমার জীবন এমন করে বিকল করে দিল। সেইজন্য আমি  
 পাপকার্য্যে মত দিই নাই। যা থাকে আমার অদৃষ্টে, তাই হবে।  
 তোমরা আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করছ, কর ; এতে আমার কষ্ট  
 হচ্ছে বটে ; তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার বুক কেটে যাচ্ছে বটে ;  
 কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা কাকীমা, আমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ  
 করে নাই। আর আশীর্বাদ কর, যেন আমি চির-জীবন এই  
 স্পর্শা নিয়ে কাটিয়ে যেতে পারি ;—আমার নারীত্বের গর্ভই  
 আমাকে রক্ষা করবে।”

ছোট বৌ বলিলেন, “লক্ষ্মী, তোমার কথা সবই ঠিক—তুমি  
 আমাদের সেই লক্ষ্মীই আছ। তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দিতে  
 পারে, কার সাধ্য। সে সব কথাই মানি। কিন্তু সমাজের দিকে  
 চাইলে, একটা কথা মনে হয়। মনে কর, যেখানেই থাক,  
 তোমার যদি নিকরিয়ে প্রসব হয় ; তারপর কি হবে ? ছেলেই  
 হোক আর মেয়েই হোক, সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে কি বলে  
 পরিচয় দেবে ? তার ছর্ভাগ্যের কথা কি ভেবেছ ? তোমার  
 কোথায় স্থান হবে, তা কি ভেবেছ না !”

লক্ষ্মী বলিল, “ছেলে হোক মেয়ে হোক, তার পিতৃপরিচয়  
 থাকবে না। সে পরিচয় দেবে—সে সতীমায়ের সন্তান—সে  
 আজীবন ব্রহ্মচারিণীর সন্তান। আমি তার কাছে কিছু গোপন  
 করব না। ইহার মধ্যে আমার কলঙ্কের কোন কথা নেই, যে

আসছে তারও কলঙ্কের কথা কিছু নেই। সমাজে এমন দেখা  
 যায় না, বলবে; তাই সমাজ এ সব লুকিয়ে কেলে; মহাপাতকের  
 কাজ করে সমাজ সব ঠিক রাখতে চায়। আমি তা  
 পারলাম না। ছল, প্রতারণা, পাপের কাজ রামকৃষ্ণ বীড়ুষ্যের  
 মেয়ে করতে পারে না। সত্যি মায়ের গর্ভে আমার জন্ম কাকীমা!  
 পাপকে, ছলনাকে, মিথ্যা-প্রবঞ্চনাকে আমি প্রাণের সঙ্গে ঘৃণা  
 করি। তারই জন্ত আমি সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিলাম।  
 ভবিষ্যতে কি হবে, তাই জিজ্ঞাসা করছ? সে ভাবনা আমি  
 ভাবি না। আমি কি কোনদিন ভেবেছিলাম, আমার অন্তর্গত  
 এই হবে? আমাকে এমন করে তোমাদের ছেড়ে যেতে  
 হবে? কাকীমা, এতদিন বাবার কাছে বুধা উপদেশ পাই  
 নাই,—এতদিন দেবতার মত কাচার কোলে বুধা মানুষ হই  
 নাই,—এতদিন তোমাদের মত মা-কাকীমার স্নেহে বুধা বড় হই  
 নাই। তোমাদেরই কাছে শিখেছি, উপরে একজন আছেন;  
 দণ্ড তিনি দেন, পুরস্কারও তিনি দেন। কার ব্যবস্থা কে  
 করে কাকীমা! তোমাদের স্নেহের কোলেই ত ছিলাম; কিন্তু  
 কি, যে দিন ব্রহ্মজন্মের মত কে এসে, আমাকে তার পণ্ড-প্রকৃতির  
 কাছে বলি দিল, তখন ত কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারলে না।  
 ত হই না কাকীমা! তা কোনদিনই হয় না। এই কয়দিনে  
 আমি অনেক ভেবে এই বুঝেছি, এই ১৭ বছর বয়সেই বেশ  
 বুঝেছি, সকলই করেন সেই একজন। আমি তাঁরই আশ্রয়  
 ভিক্ষা করছি—তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা করব। যিনি এই বিপদে

কেলেছেন, তিনিই উদ্ধার করবেন ; আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, আত্মও বিপদে ফেলবেন । রাখতে হয় তিনি রাখবেন, মারতে হয় তিনি মারবেন । তুমি মনে করছ কাকীমা, আমি এত কথা শিখলাম কোথা থেকে । আমি আজ এই করমাসে দশ বছর বয়স বাড়িয়ে কেলেছি । আমি দিনরাত ভেবেছি । অনেক ভেবে-চিন্তে বা বুঝেছি, তাই আজ তোমাকে বললাম কাকীমা ! আর হয় ত তোমার সঙ্গে দেখা না হতে পারে,—আর হয় ত তোমাকে কাকীমা বলে, তোমার কোলে মাথা রেখে সব শোক-তাপ ভুলে যেতে না পারি কাকীমা ! কিন্তু জেনে রেখো যত বিপদ হোক, যত দুর্গতি হোক, তোমাদের স্নেহের বলে আমি কাটিয়ে উঠব । আর যদি প্রাণ যায়, তখনও কাকীমা, তোমাদের কথাই—তোমাদের স্নেহের কথাই মনে করতে-করতে জীবন বিসর্জন করব । আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে কাকীমা, তুমি একটু চোখের জল ফেলো ! অদৃষ্টে নেই, সংসার-ধর্ম করতে পেলাম না ; কিন্তু আশীর্বাদ কোরো, আমি আজ যে সাহসে বুক বেঁধে অকূল সাগরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এই সাহস, এই নারীধর্মের তেজ যেন মরণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকে ।”

ছোট-বৌ আর কথা বলিতে পারিলেন না ; তিনি লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন । লক্ষ্মীর মনে হইল, মা জগ-জননী জগদ্ধাত্রী যেন স্নেহের অন্তিম বশে তাহাকে আবৃত করিয়া দিল ; তাহার কয়েক বিন্দু অশ্রু লক্ষ্মীর মস্তকে পড়িল ;

—তাহার উদ্ভঙ্গ মস্তক শীতল হইয়া গেল,—তাহার মস্তকে যেন  
শান্তিবারি বর্ষিত হইল।

এই সময় বারান্দা হইতে অতি কোমল, কাতর স্বরে প্রশ্ন  
হইল, “মা লক্ষ্মী, জেপে আছি সু মা।”

“কাকা!”

“হাঁ মা” বলিয়া হরেকৃষ্ণ স্বরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন;  
ছোট-বৌ তাড়াতাড়ি উঠিয়া একপাশে বাইরা দাঁড়াইলেন।

হরেকৃষ্ণকে দেখিয়া লক্ষ্মী দাঁড়াইতে গেল; তিনি বলিলেন,  
“না না, উঠিস্নে। কাল সকালে ত তোকে ভাল করে দেখতে  
পাব না; একটা কথাও বলতে পারব না; তাই এখন এলাম।  
মা লক্ষ্মী, এতদিন বুক করে তোকে পান্ন করে শেষে বিসর্জন  
দিতে বাচ্ছি মা!” হরেকৃষ্ণ আর কথা বলিতে পারিলেন না,  
বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী হরেকৃষ্ণের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া শুধু বলিল,  
“কাকা!”

হরেকৃষ্ণ কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, “আর...কাকা বলে  
স্মারিস্নে মা! আমি তোরা কাকা নই। আমরা তোরা  
কেউ নই মা। সমাজের ভয়ে তোকে বনবাসে দিতে  
বাচ্ছি মা!”

লক্ষ্মী প্রাণপণ শক্তিতে কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু  
ভাগ্যর সুখ দিয়া “কাকা” ব্যতীত আর একটা কথাও বাহির  
হইল না। যে লক্ষ্মী এতক্ষণ তাহার কাকীয়ার সহিত এত



কথা বলিল, এত তেজের কথা—এত স্পর্শের কথা বলিল,  
কাকার সম্মুখে সে সব কোথার গেল—সে নীরবে অশ্রুবিসর্জন  
করিতে করিতে হুধু বলিল, “কাক—কাকা গো!”

সর্বমর্শী বিধাতা এ দৃশ্য দেখিলেন;—গভীর রজনীর অন্ধকার  
এ দৃশ্য দেখিলেন;—মেবীরূপিনী ছোটবধু এ দৃশ্য দেখিলেন;  
আর পাপতাপক্লিষ্ট দীন লেখক এ দৃশ্য দেখিয়া ধস্ত, কৃতার্থ  
হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টার সময় যাত্রা করিতে হইল। প্রাণ্তঃকাল হইতেই প্রতিবেশী জ্বী-পুঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটেই খাল। সেই খালে নৌকার উঠিতে হইবে। নৌকার কিছুদূর যাইয়া তবে শীমার পাওয়া বাইবে। হরেকৃষ্ণ ও গ্রামের দুই একজন শীমার খাট পর্যন্ত বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। জিনিষপত্র নৌকার তোলা হইল।

এখন বিদায়ের পালা। বড় কর্তা গম্ভীর মুখে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বাঁহারা তাঁহার আশীর্বাদের পাত্র, তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; বাঁহারা শ্রণম্য, বড় কর্তা তাঁহাদের চরণে শ্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

• "মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগ্রসর হইলে বড় কর্তা তাঁহাকে শ্রণাম করিয়া বলিলেন, "মধু কাকা, আপনার উপর নির্ভর করেই আমি চললাম। হরি ছেলেমানুষ, কখন এমন ভাবে থাকে নাই; আপনি সর্বদা তাকে দেখবেন; সকল সময়ই উপদেশ দেবেন। বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়বেন। আপনাকে আর বেশী কি বলব।"

কথা বলিল, এত তেজের কথা—এত স্পর্কার কথা বলিল,  
কাকার সম্মুখে সে সব কোথায় গেল—সে নীরবে অক্রবিসর্জন  
করিতে করিতে শুধু বলিল, “কাকল—কাকা গো!”

সর্বদর্শী বিধাতা এ দৃশ্য দেখিলেন ;—গভীর রজনীর অন্ধকার  
এ দৃশ্য দেখিলেন ;—দেবীকৃপিনী ছোটবধু এ দৃশ্য দেখিলেন ;  
আর পাপতাপক্লিষ্ট দীন লেখক এ দৃশ্য দেখিয়া ধন্ত, কৃতার্থ  
হইয়া গেল ।

পরদিন বেলা নয়টার সময় খাড়া করিতে হইল। প্রাতঃকাল হইতেই প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ বন্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে সমবেত হইতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটেই খাল। সেই খালে নৌকার উঠিতে হইবে। নৌকার কিছুদূর যাইয়া তবে শীঘ্র পাওয়া যাইবে। হরেকৃষ্ণ ও গ্রামের দুই একজন শীঘ্র পাওয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। জিনিষপত্র নৌকার তোলা হইল।

এখন বিদায়ের পালা। বড় কর্তা গম্ভীর মুখে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। বাহারা তাঁহার আশীর্বাদের পাত্র, তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, তাঁহারা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; বাহারা প্রণাম, বড় কর্তা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

• মধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগ্রসর হইলে বড় কর্তা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মধু কাকা, আপনার উপর নির্ভর করেই আমি চললাম। হরি ছেলেমানুষ, কখন এমন ভাবে থাকে নাই; আপনি সর্বদা তাকে দেখবেন; সকল সময়ই উপদেশ দেবেন। বিশেষ আপদে বুক দিয়া পড়বেন। আপনাকে আর বেশী কি বলব।”

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “এখানকার জন্তু তুমি কোন চিন্তা কোরো না রাম! আমি আছি, গ্রামের সকলেই আছেন। হরির কোন অসুবিধা হবে না। রাস্তা থেকে যদি পত্র লিখবার সুবিধা না পাও, কাশী পৌঁছেই একটা সংবাদ দিও। পত্র আসতে ত চার পাঁচদিন লাগবে। তার চাইতে তুমি একটা তার করে দিও। ষতদিন তোমাদের মজল মত পৌঁছা-খবর না পাওয়া যাবে, ততদিন আমরা সকলেই বড় চিন্তিত থাকব।”

বড় কর্তা বলিলেন, “তাই করব।”

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহারা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। এদিকে মেয়েদের আর বাহির হওয়া হয় না। মধু ভট্টাচার্য্য একজনকে বলিলেন, “ও হে দেখ ত, ওরা দেৱী করছে কেন, সময় যে যাচ্ছে; ওদিকে সীমার ধরা ত চাই। সীমার ফল হলে একটা দিন ঘাটে বসে থাকতে হবে।”

একজন বলিল, “মেয়েদের কি শীত্র বাঁর করা যায়। কান্নাকাটি লোগ গেছে।”

মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “কান্নাকাটি কেন? যাও, একটু জাড়াভাড়া কর। ছোট-বোমা বুঝি কাঁদছেন?”

শীতল মাঝ বলিল, “ছোট ঠাকরণ কেন, সবাই কাঁদছে। বাড়ী যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। বড় ঠাকরণ যে গরীবের মা ছিলেন। তাঁকে কি কেউ সহজে ছেড়ে দিতে চায়।”

ঘাটের উপরে দাঁড়াইয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; লোকের পর লোক বাইতে লাগিল। অবশেষে পাড়ার মেয়েদের

সঙ্গে বড় গিন্নী ও লক্ষ্মী ঘাটে আসিলেন। বড় গিন্নী মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতেই আসিলেন। লক্ষ্মী কিছু ধীর, স্থির; তাহার চক্ষে জল নাই, তাহার দৃষ্টি অবনত; ধীরে ধীরে সে মায়ের পশ্চাতে-পশ্চাতে আদিল। তাহার পর সকলকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিল। বড় গিন্নী সকলকে যথাযোগ্য আশীর্বাদ, প্রণাম করিয়া নৌকার মধ্যে ঘাইয়া বসিলেন। বড় কর্তা, হরেরকৃষ্ণ এবং আরও ছই একজন নৌকায় উঠিলেন।

ভোলা পাগ্লা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। শীতল মাঝি যখন নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল, ভোলা তখন গায়িয়া উঠিল—

“এমন সোণার কমল জাসায়্যে জলে—এ—এ—  
আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ—এ”

ভোলার এই গান শুনিয়া সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। শীতল নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভোলা তখনও গায়িতে লাগিল—

“ওরে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলেছে—এ—এ।”

যতক্ষণ নৌকা দেখা গেল, ততক্ষণ কেহই ঘাট হইতে নড়িল না। নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেল। মধু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “আজ আমাদের এ পাড়াটা সত্যসত্যই আঁধার হোলো।”

একজন বলিল, “সকলকেই যেতে হবে, তবে ছদ্মিন আগে আর পাছে।”

তোলা পাগলা বলিল, "টুক বলেছ দাদা—মাখ কথার এক  
কথা।" এই বলিয়াই সে গান ধরিল—

"স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে

চিরদিন ত কেউ রবে না।

ওরে, সেই স্বদেশ তোমার, নয় যে এ পার,

ওপার আছে তা জান না ;

কেমনে ও-পার বাবে, পার হইবে,

সে ভাবনা কেউ ভাব না।"

বড় কর্তা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, নৈহাটা হইয়া কাশী যাইবেন, কলিকাতায় আর যাইবেন না; কিন্তু পথের মধ্যে তাঁহার মত পরিবর্তন হইল। জন্মের মত দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে,— একবার কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করিয়া যাইবেন না? তাই কালীঘাটে একদিন থাকিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। গ্রামের দুই চারিজন লোক কর্ম্মোপলক্ষ্যে কলিকাতায় থাকেন। পূর্বে সংবাদ দিলে, তাঁহারা ঠেসনেও উপস্থিত থাকিতে পারিতেন এবং কলিকাতায় একরাত্রি বাসেরও ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। তাহা করা হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা শিয়ালদহে নামিয়া বরাবর কালীঘাটে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাত্রীদিগের বাসের জন্য যে সকল আশ্রম আছে, তাহারই একটীতে উঠিয়া গঙ্গাঙ্গান ও মা-কালী দর্শন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেদিন কালীঘাটেই বাস করেন; কিন্তু বড় গিন্নী তাহাতে আপত্তি করিলেন; তিনি বলিলেন, “পথের মধ্যে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই; আজই রওনা হওয়া বাক্।”

এতটা পথ নৌকায়, সীমারে ও রেলো আসিয়া লক্ষী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য বড় কর্তা বলিলেন,



“লক্ষ্মীর একটু বিষামের দরকার; সেই জন্য আরও থাকবার ইচ্ছা।”

লক্ষ্মী বলিল, “না বাবা, আমার কোনই কষ্ট হয় নাই, আমি বেশ বেতে পারব; আমার জন্য দেয়ী করবার কিছুই আবশ্যক নাই।”

গিন্নীরও, মত হইল, “মেয়েরও মত হইল, কাদেই সেই দিনই সন্ধ্যার সময়: তাঁহারা বাত্মা করিলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া বড় কৰ্ত্তা বলিলেন, “আমার ইচ্ছা হচ্ছে পথে গয়াটা হইয়া যাই।”

বড় গিন্নী তাহাতেও আপত্তি করিলেন, বলিলেন, “গয়া-কাৰ্য্য ত শেষই করা হয়েছে; তবে আর গয়ার গিৰে কি হবে? পথে আর বিলম্ব কাজ নাই। এখন কোন রকমে কাশী পৌঁছিতে পারলেই হয়।”

বড় গিন্নীর এত তাড়াতাড়ির উদ্দেশ্য কৰ্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। মেয়ের যে প্রকার শরীরের অবস্থা, তাহাতে পথের মধ্যে যদি কিছু হয়, বিশেষতঃ এই দীৰ্ঘপথ রেলো বাওয়ার তাহার সম্ভাবনাও আছে, তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। এই ভাবিয়াই গিন্নী এত তাড়াতাড়ি করিতেছেন। কৰ্ত্তা আর বিতর্ক না করিয়া একেবারে কাশী বাওয়াই স্থির করিলেন।

সন্ধ্যার পর মেল গাড়ীতে তাঁহারা কাশী বাত্মা করিলেন। লক্ষ্মীর শরীর অসুস্থ, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীতে নিরশ্রেণীর লোকের বড়ই ভিড় হয়; এই জন্য তিনি মধ্যম শ্রেণীর টিকিট করিয়াছিলেন।

স্টাফারা বে গাড়ীতে উঠিলেন, তাহাতে দুই তিনজন ভ্রমলোক ছিলেন,—সকলেই বাঙ্গালী। তিন জনের মধ্যে দুইজন বর্দ্ধমানে বাইবেন, তৃতীয় জন—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর—তিনি কাশীতে বাইবেন।

বড় কর্তা সপরিবারে কাশীবাগ করিতে বাইতেছেন, তুমিরা ভ্রমলোকটা বলিলেন, “বেশ, তা হ’লে এক-সঙ্গেই যাওয়া বাবে ? কাশীতে কি বাড়ী ঠিক করেছেন ?”

বড় কর্তা বলিলেন, “না, বাড়ী ঠিক করি নাই। সেখানে গিয়ে যা হয়, করা বাবে।”

ভ্রমলোকটা বলিলেন, “অবশ্য, বাড়ী যে পাবেন না, তা নয়; তবে আগে থাকতে ঠিক করে গেলে আর কোন অসুবিধা হোতো না।”

বড় কর্তা বলিলেন, “আপনি কি কাশীতেই থাকেন ?”

ভ্রমলোকটা বলিলেন, “এক রকম থাকি বললেই হয়; অনেক সময়ই কার্যোপক্ষে থাকতে হয়, আবার মধ্যে-মধ্যে দেশেও আসতে হয়।”

“মহাশয়ের নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?”

“বিলক্ষণ! তা পারবেন না কেন ? আমরা ত আর একেলে বাবু’নই যে, নাম জিজ্ঞাসা করলে অপমান বোধ করব। আমার নাম শ্রীসত্যচরণ দাস; আমরা কারহ—দক্ষিণ রাতী; কলকাতাতেই আমাদের চার পাঁচ পুরুষের বাস। মহাইয়ের নাম ?”

“আমার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশৰ্মাণঃ বন্যোপাধ্যায় । করিমপুর জেলায় কাঞ্চনপুরে আমার নিবাস । কাশীতে বাস করব বলেই সপরিবারে যাচ্ছি । ছেলে-পিলে আর, নেই, ঐ মেয়েটাই সফল । মেয়েটিরও অদৃষ্ট মন্দ ! তাই মনে করলাম, আর কেন, কাশীতেই শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দিই । বাড়ীতে ছোট ভাই আছেন ; বা সামান্য বিষয়-আশয় আছে, তিনিই দেখবেন শুনবেন ।”

ভদ্রলোকটা বলিলেন, “কাশীতে গণেশ মহল্লার আমার একটা ছোট বাড়ী আছে । সেটা ভাড়া দিই । বাড়ীটা কিন্তু বড়ই ছোট ; ষোতলা নর, একতলা ; দুটা শোবার ঘর আছে ; একটা বারান্দা আছে, রান্নাঘর পাইখানা পৃথক আছে । তা, আপনারও ত খুব বড় বাড়ীর দরকার হবে না । আপনার যদি পছন্দ হয়, তা হলে সেইটে আপনি ভাড়া নিতে পারেন । পল্লীটাও ভাল ; ছোট-লোকের বাস নেই । তবে একতলা, এই বা কথা । সে’তসে’তে নর, ঘর দুইখানাই খুব উঁচু । আপনার অপছন্দ হবে না । আগে যারা ভাড়াটে ছিল, তারা চলে গেলে আমি বাড়ীটাই চূর্ণ করিয়েছি । মনে করেছি, দু’চার দিনের ভাড়াটে আর রাখব না । যারা বেশী দিন থাকবে, তাদের কাছেই ভাড়া দেব । আপনি যখন কাশীবাস করতেই যাচ্ছেন, তখন আপনাকে দিতে পারি ।”

বড় কর্তা বলিলেন, “আপনি বাড়ীর কথা যা বলেন, ঐ রকম ছোট বাড়ী হলেই আমার বেশ চলবে, তিনজন মানুষ বৈ ত নর । ঘর দুইটা একটু খটখটে হলেই হোলো । মেয়েটা অসুস্থ ; সেই জন্যই একটু রোদ-হাওয়া খেলে, এই রকম বাড়ীর দরকার ।

বিশ্বনাথের কৃপার আপনার সঙ্গে পথেই আলাপ হোলো, আর আপনি এমন অবাচিত ভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হোলেন, এতে মনে বখেট ভরসা হোলো।”

সত্যাবাবু বলিলেন, “আর আমার বাসের বাড়ীও ঐ বাড়ীর কাছেই। সর্বদা দেখা-শুনা হবে; আর আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হতে পারে, তা আমি অবশ্যই করব। আপনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। আমরাও আপনাদেরই দাস; আপনাদের সেবা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।”

“কাশীতে কি আপনি বিষয়কর্ম করেন, না অমনিই বাস করেন?”

“বিষয়-কর্ম তেমন নয়। দুটা ছেলেই মানুষ হোলো। নিজে দেশেই কন্ট্রাক্টরী কাজ করতাম। বড় ছেলেটাই এখন সে সব দেখে; ছোট ছেলেটা এটর্নী হয়েছে; দু পরসা জানুছে। মেয়ে তিনটারও বিবাহ দিয়েছি। দুইটাই সুখে সচ্ছন্দে আছে; বড় মেয়েটা—সেইটাই আমার প্রথম সন্তান—বিধবা হোলো; ছেলেপিলেও নেই যে, তাই নিয়েই স্বামীর ভিটের পড়ে থাকবে। তাকে নিয়ে এলাম। তখন মনে হোলো, এক রকম সবই ত শুঁছিয়ে দিয়েছি; এখন আর কেন, কাশী গিয়ে বাস করি। তাই এই বছর তিনেক হোলো পরিবার ও মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসেছি; ছেলে-মেয়েরা মধ্যে মধ্যে আসে; আমিও যখন-তখন কলিকাতার বাই। কাশীতে গিয়ে চুপ করে থাকা ভাল লাগল না। এতকাল খেটে এসেছি—চুপ করে নিষ্কর্মা হয়ে কি থাকা যায়? তাই কাশীতেও

ঐ টুকটাক রকম কন্ট্রাক্টরী করি ;—কোন রকমে ধান তিনেক বাড়ীও করেছি। একখানিতে থাকি, সেখানি তেমন বড় নয়—তাতেই কুলিয়ে যায়। বড়খানি ভাড়া দিয়েছি, মাসে ৮০ টাকা পাওয়া যায় ; আর আপনাকে বেধানির কথা বললাম, সেখানিতেও দশ-বার টাকা আসে। ঐতে কোন রকমে চলে যায়।”

বড় কর্তা বলিলেন, “তা হলে যে বাড়ীখানি আমাকে ভাড়া দিতে চাচ্ছেন, তার ভাড়া মাসে বার টাকা। এত বেশী ভাড়া দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত হবে না। আপনাকে খুলেই বলি। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মাছুব ; সামান্য কিছু জ্যোতস্নমা আছে ; আর শিষ্য বলমানই ভরসা। বাড়ীতে ছোট ভাই আছে, ভাদ্র-বধু আছেন, গৃহদেবতা নারায়ণ আছেন ; তারপর লোক-লৌকিকতা আছে। এই সকলের মধ্য থেকে কোন রকমে মাসিক ত্রিশটি টাকার ব্যবস্থা করে, আমরা কাশী যাচ্ছি। সেই ত্রিশ টাকার মধ্যে বার টাকা যদি বাড়ী-ভাড়াই দিই, তা হলে চলবে কি করে ? হাটবাজার ও ঘরের কাজ করার জন্য একটা ঝিরেরও দরকার হবে, তার পর, পূজা-অর্চনা, পাল-পার্কণ্ড আছে।”

সত্যবাবু বলিলেন, “আপনার ঝায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যক্তি কাশীতে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারবেন। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। যেমন করে হোক, মাসে ষাড়ে গড়ে পনের কুড়ি টাকা আপনার হয়, তা অনায়াসে ব্যবস্থা করে দিতে পারব।”

বড় কর্তা বলিলেন, “কাশীতে গিরে আর দান গ্রহণের ইচ্ছা

নেই। বাড়ী থেকে যা আসবে, তাই দিয়েই কোন রকমে চালাতে হবে; অর্থ-উপার্জনের স্পৃহা আর নেই।”

সত্যাবু এই কথা শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, “আপনার সঙ্গে যখন কথা পেড়েছি, তখন আপনাকে আর অল্প হানে ধেতে দিচ্ছি। আপনি দীর্ঘকাল থাকবেন। বেশ, আপনি মাসে নয়টা টাকা দেবেন, ট্যাক্স-খাজনা সব আমার জিন্মা। আর ঝির কথা বলছেন; আমি একটা বেশ বিশ্বাসী ঠিকে ঝি দেব। মাসে তাকে দুটা টাকা দিলেই হবে। সে হাটবাজার করে দেবে, বাড়ীর কাজ করে দিয়ে ঘরে চলে যাবে। তা হলেই আপনাদের বেশ চলে যাবে। বিপদ-আপদ আছে, আমিও ত পাড়াতেই থাকুব; আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমার খবর দেওয়া আছে; সরকার ও চাকর ষ্টেশনে আসবে। চাকরটাকে আপনাদের সঙ্গে দেব এখন। সে আপনাদের নিয়ে একেবারে বাড়ীতে তুলে দেবে; আর তাকেই বলে দেব, আপনাদের জিনিসপত্রগুলো কিনে দেবে। তার পর যখন যা সরকার হবে, আমাকে বলবেন; আমি শুছিরে দেব। আমার সে বাড়ীতে তিন চারখানা তক্তপোষ আছে; আপনাদের আর সে সব করে নিতে হবে না। একতলা বাড়ী কিনা তাই তক্তপোষ রেখে দিয়েছি।”

বড় কর্তা বলিলেন, “আমার সৌভাগ্য যে পথেই আপনাকে পেলাম। আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ; আমাদের এ সব শুছিরে নিতে অনেক বেগ পেতে হোত।”

এই রকম কথাবার্তায় অনেক রাজি হইল। গাড়ী তীর-  
বেগে ছুটিতেছে। আসানসোল পার হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে  
চারিজন মানুষ মাত্র; স্তত্রাং 'বিশ্রামের কোন ব্যাঘাতই  
হইল না।

পরদিন মোগলসরাইতে গাড়ী বদল করিতে হইল। সত্য-  
বাবুই কুলী ডাকিয়া দ্রব্যাদি কাশীর গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী কাশী ষ্টেশনে পৌঁছিল। সত্যবাবুর সরকার  
ও চাকর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। তিনি সকলকে নামাইয়া,  
একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, চাকরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন,  
এবং তাঁহাদের যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিবার  
আদেশ দিয়া নিজে স্বত্ত্ব গাড়ীতে বাসায় গেলেন। "

শ্রীবৃক্ষ সত্যচরণ বাবু অতি সঙ্গীয় ব্যক্তি। বড় কর্তার সহিত গাড়ীতে পরিচয় হইয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ অতি পণ্ডিত, সংলোক। তাঁহাকে সপরিবারে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া সত্যবাবু নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। বড় কর্তার সহিত কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি চোদ্দ পুনর বৎসর পূর্বে একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন, এবং দুই তিনদিন বাঙ্গালী-টোলার একটা বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; কাশী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। সেই জন্য সত্যবাবু তাড়াতাড়ি আহায়াদি শেষ করিয়া তাঁহাদিগের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় কর্তা ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা সন্মান করিয়া, বাসকয় ফিরিয়া আসিয়াছেন; রন্ধনাদির কোন উদ্যোগ আরোজনই করা হয় নাই।

সত্যবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাড়ীঘে মশাই, পাকের কোন উদ্যোগই ত দেখছি না।”

বড় কর্তা বলিলেন, “এই সব গল্পান্ন কর, পূজো-আহ্নিক শেষ করে এলাম। বেলাও প্রায় তিনটা বাজে; এখন



আর পাকের যোগাড় করা সম্ভব মনে করিলাম না। সন্ধ্যার পরই বাহর করা যাবে। আপনার চাকর রমেশ লোকটী বেশ, কিছুই অসুগত। সে ঘরদ্বার পরিষ্কার করে দিয়ে জিনিষপত্র কিনবার টাকা নিয়ে গেছে। তারও ত আহার হয় নাই। তাকে বলে দিয়েছি, ভাড়াভাড়ির দরকার নেই; সে যেন আহারাধি করে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, আমার জিনিষগুলি কিনে দিয়ে যান। আপনার এ বাড়ীটী অতি সুন্দর, দাস মহাশয়! আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে; বেশ দক্ষিণ-খোলা বাড়ী; ঘরগুলোও ভাল। আঁধার নেই। আপনার অসুগ্রহ ও সাহায্যের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আপনার সঙ্গে গাড়ীতে দেখা না হলে আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হোত; হয় ত এতক্ষণও বাড়ী মিলত না; আর মিললেও এমন মনের মত হোত না। তার পর, এই বিদেশ যাত্রায় আপনার মত সহায় লাভ করাও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।”

সত্যবাবু বলিলেন, “আপনি এমন কথা বলছেন কেন? আমি আর আপনার কি সাহায্য করলাম। বাড়ী খালি ছিল, ভাড়া দিলাম; এই ত। এর অল্প আপনি এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন কেন?”

বড় কর্তা বলিলেন, “দাস মহাশয়! আমার মত অবস্থার পড়লে আপনি বুঝতে পারতেন। কাশী বাবা বিবেচনের দ্বারা, নিন্দা করতে নেই। কিন্তু কাশী মহাশয় আমার তিনদিনের অভিজ্ঞতা বা সেই পনের বছর আগে জন্মেছিল, তা কিন্তু আমি এত

দিনেও ভুলতে পারি নাই। তাই মনে বড় আশঙ্কাই জন্মেছিল। এখন আমি নিশ্চিত হয়েছি।”

সত্যাবাবু হাসিয়া বলিলেন, “আপনি ত নিশ্চিত হয়েছেন ষড়্‌যুগে মশাই, কিন্তু আমি ত নিশ্চিত হোতে পারলাম না। আমার বাড়ীতে আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান এসে এতক্ষণ উপবাসী রয়েছেন, মাঠাকরুণ আর মেয়েটীও হয় ত মুখে একটু জল দেন নাই, এতে আমাকে নিশ্চিত করতে পারল না।”

বড় কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “জানেন কি সত্যাবাবু, আমরা যজন-বাবসায়ী ব্রাহ্মণ, আমাদের মাসের মধ্যে যেমন করে হোক দশ দিন উপবাস করতেই হয়; তাতে আমাদের কষ্ট হয় না। আমরাও ও-বিষয়ে যেমন পরিপক্ব, আমাদের গৃহিণীরাও কম নন; আমরা যদি মাসে দশদিন উপবাস করি, তাঁরা করেন পনের দিন। সুতরাং সে জন্ত আপনার চিন্তার প্রয়োজন দেখছি না। গৃহিণী গঙ্গাজল নিয়ে এসেছেন, আর এক পয়সার বাতাসাও কিনে এনেছি; ফল-টল বড় দেখতে পেলাম না,—অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে কিনা,—সেই বাতাসা মুখে দিয়ে গঙ্গাজল পান করে আমরা বেশ তৃপ্তি লাভ করেছি। রনেশ বিকেল-বেলাই সব নিয়ে আস্বে; সন্ধ্যার পরই যা কর করা যাবে। একটা গৃহস্থালী নুতন করে পাওতে সময় লাগে সত্যাবাবু!”

সত্যাবাবু বলিলেন, “আপনারা দুইজনে ত বেশ ব্যবস্থা করলেন এবং ভুলও হলেন; কিন্তু মেয়েটী যে কষ্ট পাচ্ছে।

সে ত এখনও আপনাদের মত উপবাসে অভ্যস্ত হয় নাই ; বিশেষ তাকে যে রকম "অস্থস্থ দেখলাম, তাতে তার এসেই গঙ্গাস্নান করাটাই ভাল হয় নাই। তার পর এই উপবাস। একটা অস্থস্থ হতে ত পারে।"

বড় কর্তা বলিলেন, "আমরা মেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে শিখিয়ে থাকি সত্যাবাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না ; লক্ষ্মীর কোন কষ্ট হবে না।"

"না, না, সে হতেই পারে না বাঁড়ুয়ো মশাই। বাজারের মিষ্টান্ন না হয় মেয়েটা নাই খেলো ; আমি ফলসূতা ও রাবড়ী এনে দিচ্ছি—এখানকার রাবড়ী অতি উৎকৃষ্ট, জানেন ত ?"

বড় কর্তা বলিলেন, "কিছু দরকার নেই সত্যাবাবু! আপনি যে রকম আরম্ভ করলেন, তাতে দেখছি আমাদের এ বাড়ী থেকে পাকাতে হবে।"

"সে দেখা যাবে" বলিয়া সত্যাবাবু চলিয়া গেলেন। বড় কর্তা সহাস্ত বদনে উত্তরে বাইরা বড় গিন্নীকে বলিলেন, "গিন্নী, কাশী-বাসের সূচনাটা ত ভাল বলেই বোধ হচ্ছে।"

বড়-গিন্নী স্বামীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া ক্রমশঃ বড়ই শান্তি অনুভব করিলেন। আজ কতদিন তাঁহার মুখে কেহ হাসি তিনি দেখেন নাই ; তাই হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ করুন, এমনই করে সব দিকে মঙ্গল হয় ; তা হলে বাবাকে পূজা দেব।"

বড় কর্তা বলিলেন "তাই হবে গিন্নী, তাই হবে। বাবার

ধামে এসে কারমনোবাক্যে তাঁকে ডাকলে কোন বিপদ থাকে না। আমরা মোহে অন্ধ, তাই বিপদ দেখে ভয়ে কাতর হই গিয়া। বিপদভঞ্জন বিখনাথের নাম ভুলে যাই; আর সেই জন্ত কত অকার্য্য কুকার্য্য করি। মা লক্ষ্মী, মান করে ত তোমার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে না? ঐ ভয়ে কাল কালীঘাটে তোমাকে গঙ্গান্নান করতে দিই নাই।”

লক্ষ্মী বলিল, “না বাবা, আমি বেশ আছি। ঐ বাবুটি আমার জন্ত কষ্ট করে খাবার আনতে গেলেন, তুমি যেতে দিলে কেন বাবা!”

“উনি যে তোমার বাবার কথা শুনলেন না। ঔরুও মেয়ে আছে মা! সন্তানের উপর মা-বাপের যে কি মমতা, তা যে উনি জানেন। আমিই তোমার পাষাণ পিতা!” বলিয়াই বড় কর্তা মুখ মালিন করিলেন। পিতার প্রেসন্ন বদন দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে যে শাস্তি আসিয়াছিল, তখনই তাহা দূর হইয়া গেল, তাহার নয়নধর অশ্রুপূর্ণ হইল।

বড় কর্তা লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার বড়ই অনুশোচনা হইল। তিনি বলিলেন, “লক্ষ্মী মা আমার, তোমার এই বুড়া বাপের কথায় মনে কষ্ট কোরো না মা! আমার কি আর এখন বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। যাক্, সত্যবাবু এল তাঁকে বলে রাখতে হবে, তিনি যেন বিখনাথের আরতি দেখাবার জন্ত আমাদের সঙ্গে একজন লোক দেন। ঐ রমেশকে দিলেই হবে। দুই একদিন পথ দেখিয়ে দিলেই

শেষে আমরা যেতে পারব। এই ত, আজ গঙ্গামান থেকে  
ফিরবার সময় রমেশ ত আর পথ দেখার নাই; সে সঙ্গে মাজ  
ছিল; আমরাই ত ঠিক পথ ঠিনে এসেছি; কি বল মা!”

লক্ষ্মী বলিল, “সহরের পথে-ঘাটে চলা ত আমাদের অভ্যাস  
নেই, তাই কেমন বাধ-বাধ ঠেকে; লোকজন দেখলে কেমন  
সঙ্কোচ বোধ হয়, না বাবা!”

বড় কর্তা বলিলেন, “এখানে ছুইচার দিন চললে-ফিরলেই  
সঙ্কোচ দূর হবে। দেখ, আরতি দর্শন করে এসে তার পর  
পাকের যোগাড় করা যাবে।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “সব গুছিয়ে রেখে যাব। এসেই রান্না  
চড়িয়ে দেব। আজ আর কোন হাসানি করা হবে না; হুঁটো  
ভাতে-ভাত করলেই হবে।”

রমেশ বাহিরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তাহার  
সঙ্গে একটা কুলীর মাথার কতক জিনিসপত্র, আর কতক সে  
নিজেই বহিয়া আনিয়াছে।

বড় গিন্নী বলিলেন, “বাবা, তুমি কষ্ট করে এত জিনিস বয়ে  
আনলে কেন? আর একটা লোক নিলেই ত হোতো। আহা,  
তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছে।”

রমেশ বড় গিন্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, “মা ঠাকরণ, আমাদের  
কি আর এতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় কিসে জানেন; যখন গ্রাম  
দিয়ে খেটেও মনিবের মন পাইনে, গালাগালি শুনি, তখনই কষ্ট  
হয়। আমাদের মুখ চেরে ‘আহা’ বলবার লোক নেই বলেই

জানতাম। আজ দেখলাম আছে গো আছে। ওরে জিনিস-  
গুলো নামা।” এই বলিয়া দ্রব্যাদি নামাইয়া বারান্দার রাখিতে  
লাগিল।

সমস্ত জিনিস নামাইয়া কুলী বিদায় করিয়া রমেশ বলিল  
“ঠাকুর মশাই, হিসাবটা ঠিক করে নি। মাঠাকরুণ, দেখুন,  
কিছু অন্তে ভুল ত হয় নাই। আমি এই হিসাব বুঝিয়ে দিই  
একবার যাই। বাড়ীতে কত কাজ পড়ে আছে। তারপর আবার  
একবার আস্ব এখন মাঠাকরুণ! তখন যদি কিছু আরও আনবার  
দরকার থাকে, এনে দিই যাব। ঠাকুর মশাই, এই ধরুন, তিন  
সের আতব চা’ল; এই দশ পয়সা করে সের হ’লে হোলো  
গিয়ে—”

তাহার হিসাবে বাধা দিয়া লক্ষ্মী বলিল, “তোমাকে হিসেব  
দিতে হবে না। বা পয়সা বেঁচেছে, তাই মার-হাতে দিয়ে যাও; আর  
যদি বেশী খরচ হয়ে থাকে তাই বল; ‘অন্ত হোলো গিয়ে—’  
দরকার হবে না।”

রমেশ বলিল “মা ঠাকরুণ, তাই বুঝি ~~দুই-তিন~~ নাম  
লক্ষ্মী রেখেছেন মা! দশ বছর বয়স থেকে এই ~~কাজ~~ নাম  
করিছি, আর আজ এই পঞ্চাশ বছর বয়স গেলো, এমন লক্ষ্মী ত  
কোন দিন দেখিনি মা ঠাকরুণ! আরও না হয় ত দশ-বারটা  
বাস্তালী বাবুর বাড়ী চাকরী করেছি।”

বড় কর্তী বলিলেন, “রমেশ আমরা যে বাবু নই; আমরা  
গরিব ব্রাহ্মণ।”

“ঠিক, তা নইলে কি এমন লক্ষ্মী ঘরে আসে। তা হোক ঠাকুর মশাই, পাঁচ টাকা ত দিয়েছিলেন তার এই—  
সবুর করুন গণে দেখি। এই হোলো ছুইটা দিকি, আর—”

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, “আবার হিসেব—আবার এই হোলো।”

“তা হলে কি করব দিদি ঠাকরুণ, তুমিই বলে দেও।”

“বা আছে মার কাছে কেলে দেও; উনি গণে নিতে হয়  
নেবেন, না তর তুলে রাখবেন।”

“দিদি ঠাকরুণ, এখনই করে বুঝি সংসার করবে! গণতে হবে  
লক্ষ্মী দিদি, গণতে হবে। গণে-গণে পা কেলেতে হয় দিদি—পা  
পর্যন্ত কেলেতে হয়। তা সে কথা এখন থাক। দেখুন ঠাকুর মশাই,  
কাশী যাবগা; অমন করে বাইরের ছয়োর খুলে রাখবেন না;  
স্নাত-বিরেতে থাকে, তাকে ছয়োর খুলে দেবেন না। আমি যখন  
এসে ডাকব ‘ঠাকুর মশাই, আমি রমেশ’ তখনই ছয়োর খুলবেন।  
অন্ন থেকে এই কাশীতে কাটালাম কি না; এর হাট হদ্দ এই  
রমেশ জানার জানতে বাকী নেই। এখন আমি তা হলে মা  
ঠাকরুণ আসি!—একটা প্রণাম করে বাই।”

লক্ষ্মী বলিল, “আস্তে-ষেতে যদি এত প্রণাম কর, তা হলে  
তোমার মাথা ব্যথা হয়ে বাবে যে!”

রমেশ বলিল, “প্রণামের কথা যদি তুললে দিদি লক্ষ্মী, তবে  
শোন। এই যে দেখছ রমেশ জানা—কৈবর্তের ছেলে—এ কোন  
দিন—আজ পর্যন্ত কোন দিন কাউকে প্রণাম করে নাই—  
তোমার ওই বাবা বিশ্বনাথকেও না—সেই মা অন্নপূর্ণাকেও না—

মাতৃ ত কোথায় থাকে ;—বাদের চাকরী করেছি, আর এখনও  
 করছি, তারা যোল আনা মাহিনে দেয়, আঠারো আনা খেটে দিই  
 —বাস্। প্রণাম করব কেন ? কার কাছে কি উপকার পেয়েছি—  
 কার কাছে দুটো মিষ্টি কথা পেয়েছি, যে তাকে প্রণাম করব।  
 এই যে তোমরা যখন গাড়ী থেকে নামলে, তোমরা ত বামুন,  
 তোমাদের ত প্রণাম করতে হয় শান্তরে লেখে। আমি কি প্রণাম  
 করেছিলাম ? সে ছেলে পাও নি এই রমেশ জানাকে মা ঠাকরুণ !  
 আজ এই আপনাকে মাঠাকরুণ প্রথম প্রণাম করছি, আর বরসে  
 ছোট হলে কি হয়—আর এই তোমাকে প্রণাম করছি দিদি লক্ষ্মী !  
 রমেশ জানার মাথাটা তোমরাই নোয়ালে এই এতকাল পরে।”  
 এই বলিয়া রমেশ দুইজনকে প্রণাম করিল।

বড় কৰ্ত্তা বলিলেন, “আমাকে একটা প্রণাম করলে না রমেশ !”

রমেশ অগ্নানবন্ধনে বলিল, “না ঠাকুর মশাই ! রমেশ জানা  
 মানুষ চেনে। এখন যাই। আবার আসব এখন। স্নাত্তিরে  
 এসে মাঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ, গান শুনিবে যাব।” এই বলিয়া  
 রমেশ চলিয়া গেল।

বড় কৰ্ত্তা বলিলেন “মা লক্ষ্মী, এই যে রমেশকে দেখছ, এ  
 দেবতা—মাতৃ নর।”

রমেশ চলিয়া যাওয়ার পরই সত্যাবাব আসিয়া উপস্থিত  
 হইলেন ; সঙ্গে একটা লোক ; তাহার মাথায় একটা চেঙারি।  
 বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিলেন “বাড়ীয়ে মশাই,  
 একবার বাইরে আসবেন।”



বড় কৰ্তা বাহিৰে আসিয়াই দেখেন, সত্যাবু উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন ; সন্মের লোকটী চেপাৰিখানি বান্ধাৰ নামাইয়াছে ।

বড় কৰ্তা বলিলেন, “এ সব কি সত্যাবু ?”

সত্যাবু বলিলেন “টক কিছুই না ।” এই বলিয়া লোকটীৰে পয়সা দিয়া বিদায় কৰিলেন ।

বড় কৰ্তা বলিলেন, “এমন অভ্যাচার কৰলে আনাকে যে এ বাড়ী চেড়ে পালাতে হবে ।”

“যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন আর পালাবার পথ নেই । মেয়েকে ডাকুন, এগুলো ঘরে নিয়ে গিয়ে এখনই কিঞ্চিৎ জলখাবাৰের ব্যবস্থা কৰে দিক্ ।”

বড় কৰ্তা বলিলেন, “এ ত জলখাবাৰ নয়, এ যে ভোজের ব্যাপাৰ ।”

“ব্রাহ্মণের মুখে এমন কথা শোভা পায় না ; তেমন খাইয়ে হ’লে এ সামান্য জিনিস ত তার কাছে নষ্ট-বললেই হয় ।”

বড় কৰ্তা তখন লক্ষীকে ডাকিলেন ; বলিলেন, “মা লক্ষী, ছোট সত্ৰকি খানা বাহিৰে দেও । সত্যাবুকে বসবার আৰ কি আসন দেব । আৰ এইগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সত্যাবুৰ জন্ত একটু জলখাবাৰের আয়োজন কৰে দেও মা ।”

সত্যাবু বলিলেন “মা প কৰবেন বীড়য্যে ২শাই, আমি এই অবলায় খেয়েছি । বেশ ত, আৰ একদিন এসে প্রসাদ পেয়ে বাব ; আজ নয় ।”

লক্ষী জিনিসগুলি ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিল “মা

বলছেন, আপনি একটু জল না খেলে তিনি বড়ই দুঃখিত  
হবেন।”

“তা হলে আর উপায় নেই মা! আচ্ছা আমি বসছি। তোমার  
বাবাকে আগে দেও; তার পরে আমি প্রসাদ পাব।”

তখন ছুইজনে নানা গল্প করিতে লাগিলেন। একটু  
পরেই লক্ষ্মী বাহিরে আসিয়া বলিল, “বাবা, জলখাবার দেওয়া  
হয়েছে; কিন্তু বসবার যে আসন নেই; সব একখানি কুশাসন  
তোমার আহ্নিকের জন্ত বাড়ী থেকে আনা হয়েছিল।”

সত্যবাবু বলিলেন, “আমার আসনের দরকার নেই। আমি  
বাসা থেকে খান-ছুই আসন পাঠিয়ে দেব। আর কি কি দরকার,  
আমাকে বলে দেও ত মা!”

লক্ষ্মী বলিল, “আর কিছুই ত এখন দরকার দেখছি।”

তখন ছুইজনেই সামান্য কিছু জলযোগ করিলেন। তাহার  
পর বড় কর্তা বলিলেন, “সত্যবাবু, আমরা ত পথ-ঘাট চিনিনে।  
রমেশকে যদি সন্ধ্যাবেলা একটু ছেড়ে দেন, তা হলে আমাদের  
বিখনাথের আরতি দেখিয়ে আনে। ছুই-এক দিন সঙ্গে নিয়ে  
গুলোই আমরা পথ-ঘাট চিনে নিতে পারব।”

সত্যবাবু বলিলেন, “আমি বাসার গিরেই রমেশকে পাঠিয়ে  
দিচ্ছি। তাকে আরও বলে দেব যে, বাসায় খাওয়া-দাওয়া শেষ  
হলে সে যেন এখানে এসে রাত্রিতে শুয়ে থাকে। নূতন স্থানে  
এসেছেন; কখন কি দরকার হয়, তা ত বলা যায় না। একটা ঠিকে  
কি কালই পাঠিয়ে দেব।” এই বলিয়া সত্যবাবু চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রমেশ সকলকে সঙ্গে লইয়া বিখনাথের আরতি দেখাইয়া আনিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সে রাত্রিতে এখানেই থাকিবে, বাবু জুকুম দিয়াছেন।

বড় গিন্নী বলিলেন, “রমেশ, তোমার শোবার বিছানার কি হবে ? আমাদের সঙ্গে ত বেশী বিছানা নেই ; আমরা ছোট এক খানি সত্তরঞ্চি দিতে পারব।”

রমেশ বলিল, “সে জন্ত ভাববেন না মাঠাকরুণ, সে সব আমি ঠিক করে নেব।”

“না বাছা, তুমি বাসা থেকে তোমার বিছানা নিয়ে এস, নইলে যে কষ্ট হবে।”

“তা হলে রমেশের কষ্টের কথা ভাববার লোক এতদিনে একজন জুটে গেল দেখছি। আজ এই চল্লিশ বছর তুমি কোথায় ছিলে মা ! আমার মা মরবার পর এ চল্লিশ বছর ত কেউ আমার কষ্টের কথা ভাবে নাই।”

এই বলিয়া গুন-গুন করিয়া কি যেন গায়িতে-গায়িতে রমেশ চলিয়া গেল।

নৃতন করিয়া সমস্ত গোছাইয়া রান্না আহার শেষ করিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল। রমেশ দশটার সময় আসিয়া দেখে, তখনও বড় কর্তা আহারে বসেন নাই। রমেশ রান্না-ঘরের নিকট যাইয়া বলিল, “মা ঠাকরুণ, এখনও রান্না হোলো না, রাত যে দশটা বেজে গেল। তোমাদের কি, তোমরা ত দশদিন উপোস করেও কাটাতে পার; দিদি লক্ষ্মী যে ক্বিদেয় মারা পড়বার যো হোল।”

লক্ষ্মী বলিল, “আমার আজ আর না খেলেও চল।”

“তবে আর কি, মাঠাকরুণ, উন্নন নিবিয়ে দিন। দশটা বাজল দেখে, আমার মনে হোলো মা, তোমরা বুঝি আমার জন্ত বসে আছ। তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম গেরে, অমনি নাকেমুখে চারটে দিয়ে দৌড়ে এলাম। এখন দেখি কি না, তোমাদের রান্নাই নামে নাই।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “মনে করেছিলাম, আজ আর কিছু করব না, আলু ভাতে দিয়ে চারটা জাত নামিয়ে নেব; কিন্তু শেষে ভাবলাম, কর্তার স্মৃখে কেমন করে আলু-ভাতে জাত ধরে দেব। তা ত কোন দিন পারি নাই বাছা! তাই ডাল রাধতে হোলো,

একটা ভাড়াও করতে হোল। তারপর মনে করলাম, এতই যদি হোলো, তা হলে আর একটু তরকারী রাখতেই আর কতটুকুই বা সময় লাগবে। এখন এই ভাতটা চড়িয়ে দিয়েছি; নামলেই কর্তার ভাত দিই।”

“তা মা, এতই যদি হয়েছে, তবে আর একটু স্নুজুনি করতেই বা কতক্ষণ, তারপর একটা অখল, সে আর কয় মিনিটের কাজ। এমনই করতে-করতে রাত পুরিয়ে যাক; তা হলেই খাওয়া হবে।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “কা’ল থেকে আর রাত হবে না। রমেশ, তুমি না বললে, তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দিয়ে এসেছ। তা হলে বাছা, তোমারও খাওয়া হয় নাই বললেই হয়। তুমিও ছুটো খেয়ো।”

“মা, তুমি কি অন্নপূর্ণা হয়েছে? রেঁধেছ ত তিনজনের স্নাত্ত; এদিকে বলছ, রমেশ তুমিও ছুটো খাও। তার পর!”

“ওরে পাগল ছেলে, কর্তার ভাত বেড়ে দিয়ে, আর ছুটো চাল তুলে দিয়ে নামাতে কতক্ষণ! তাই হবে, তোমাকে বাছা ছুটো খেতেই হবে। তুমি যদি কষ্ট করে এ সব না এনে দিতে, তা হলে আজ যে খাওয়াই হোত না।”

“তাই বুঝি মা, খার শোধ দিতে চাও।”

এই রকম কথাবার্তার রান্না শেষ হইল। বড় কর্তা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিল। তিনি আহার করিয়া উঠিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীকে

রান্নাঘরের মধ্যে ভাত দিয়া, বড় গিন্নী একখানি থালায় করিয়া  
ভাত বাড়িয়া বারান্দায় আনিয়া দিলেন।

বড় কৰ্ত্তা বলিলেন, “বেশ বেশ, রমেশকে খেতে বলেছ, বেশ  
করেছ। কিন্তু কি দিয়ে খাবে।”

“কেন, হাত দিয়ে খাব। আমি ত খেয়েই এসেছি। মা ঠাক-  
রুণ ছাড়লেন না, তাই প্রসাদ পেতে বসেছি।”

রমেশ খাইতে খাইতে বলিল, “মা ঠাকরুণ, এমন ডাল কখনও  
খাই নি মা ! ডাল নয় যেন অমৃত।”

“আর একটু ডাল দেব বাবা !”

“ঐ শোন কথা। তিন জনের মত রান্না, তার মধ্যে আমি  
এসে ভাগ কলাগাছ ; এখনও বলেন ‘আর একটু দেব।’ দেবে  
বে মা ! তার পর, নিজেরা কি খাবে ?”

“বাহা, আমাদের কিছু না হলেও পেট ভরে।”

“সে আজ আর কাজ নেই। আর একদিন এমনই করে ডাল  
রাঁধতে হবে, সেদিন দেখাব, এই রমেশ জানা কেমন খেতে পারে।”

রমেশ আহার শেষ করিয়া উঠিতে যাইবে, তখন বড় গিন্নী  
বলিলেন, “রমেশ, বাবা উঠো না ; একটু মিষ্টি দেব।”

“মা গো, ছেলেবেলার বর্ণপরিচয়ে পড়েছিলাম, এখনও মনে  
আছে, ‘অধিক অমৃত খাইলে পীড়া হয়’ ; শেষে কি মারা বাব।”

“না, না, রমেশ, একটু মিষ্টি খাও। তোমার মনিবই ধিয়ে  
গেছেন।” এই বলিয়া হুইটা পেড়া ও খানিকটা রাবড়ি রমেশের  
পাতে দিয়া গেলেন।

রমেশ, বলিল, “আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম ; দেখে দেখি, মা পেলাম, বোন পেলাম—দুইদেবের লোক পেলাম । আমি ঠিক বলছি মা ঠাকরণ, পূর্ব জন্মে তুমি আমার মা ছিলে ; নইলে এই কয় ঘণ্টার মধ্যে কি এমন হয় ।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “রমেশ, তোমার মত ছেলে পাওয়া অনেক তপস্তার ফল ।”

সকলের আহ্বারাদি শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল, “তুমি তা হলে আমার দাদা হলে । এখন থেকে তোমাকে রমেশ দাদা বপেই ডাকব । তুমি যে গান শোনাবে বলেছিলে, তা আমার মনে আছে । একটা গান কর ।”

রমেশ বলিল, “আজ অনেক রাত হয়েছে দিদি, লক্ষ্মী; আজ আর গান শুনে কাজ নেই ; আজ শোও । রমেশ তা বাধাই পড়েছে । কত গান শুন্তে পার, কাল থেকে দেখব ।”

বড় গিন্নীও বলিলেন, “লক্ষ্মী, কাল রেতে ত ঘুম হয় নাই, পরহুও তাই । আজ এখন শোও । একে শরীর ভাল নয়, তার পর এই অনিয়ম ।”

সকলে শয়ন করিলেন । রমেশের আর ঘুম আসে না । সে গান ধরিল—

“যার মা আনন্দময়ী, তার কেন নিরানন্দ ।

তবে কেন ষোকে দুঃখে নিরাশার সঙ্গ কাঁড় ।

পরদিন সত্যাবাবু একজন হিন্দুস্থানী ঝি পাঠাইয়া দিলেন। সে বাজারহাট করিবে এবং দুই বেলা বাসন মাজিবে ও অত্যন্ত কাণ্ড করিয়া দিয়া যাইবে; মাসে তাহাকে দুইটী করিয়া টাকা দিতে হইবে। রমেশ কয়েক দিন রাত্রিতে আসিয়া এই বাড়ীতেই থাকিবে, সত্যাবাবু এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রমেশ কিন্তু যখনই একটু অবকাশ পায়, তখনই এই বাড়ীতে আসে, এবং বাজার-হাট করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে আসিয়া দেখে, সকলেই তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। রমেশ বলিল, “আজ এত শীগ্গিরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে।”

বড় গিন্নী বলিলেন, “আমরা ত এ-বেলা রাঁধি নাই; কর্তা যাত্রা ত কিছু খান না, লক্ষ্মীও খায় না। আমরা এ-বেলা জল খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আজ আর আরতি দেখতে যাওয়া হোলো না।”

“কেন, ঝিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতে মা।”

বড় গিন্নী বলিলেন “বাড়ীতে লক্ষ্মী একেলা কি থাকতে পারে? তার শরীর ভাল নয়। কা’ল এতখানি পথ হেঁটে তার অস্থির



বোধ হয়েছিল; তাই আজ তার বাওরা ঠিক মনে হোলো না, আমরাও যেতে পারলাম না।”

“সে কথা আমাকে বললেই পারতে মা! আমি এসে তোমাদের নিয়ে যেতাম, দিদি লক্ষ্মীর কাছে বি থাকত। যাক, কাল থেকে সে ব্যবস্থা করা যাবে।”

লক্ষ্মী বলিল, “রমেশ দা, তোমার আর কে আছে?”

“আমার? আমার কেউ নেই—আমি একেলা মাতুবা।”

“যৌ, ছোট-পিলে, মা-বাপ, কেউ নেই?”

“না দিদি লক্ষ্মী, কেউ নেই।”

“সবাই মারা গেছে?”

“মা-বাবা মারা গেছে। আমি যখন তিন বছরের, তখন এই কালীতেই বাবা মারা যান। মা বাবা আমাকে নিয়ে তীর্থ করতে এসেছিল; এখানে এসেই বাবা মারা গেল। সঙ্গে কিছু টাকা ছিল। মা আর দেশে গেল মা; আমাকে নিয়ে এখানেই থাকল। তার পর আমার বয়স যখন দশ বছর কি এগার বছর, তখন মাও মারা গেল। তখন আর কি, আমি একলা। এই ছয় সাত বছরে মার হাতে বা ছিল, তা ছুরিয়ে গিয়েছিল। মা এক বাড়ীতে দাসীর কাম করত, তাতেই আমাদের চলে যেত। সেই সময় আমি একটু বালালা লেখাপড়া শিখি, বুঝলে দিদি লক্ষ্মী! মা মরে গেলে আমি আর কি করব,—এই চাকরী আরম্ভ করে দিলাম। আজও চাকরী, কালও চাকরী—এই চল্লিশ বছর চাকরীই করছি—এই কালীতেই আছি।”

লক্ষ্মী বলিল, "তার পর বিয়ে-খা করে ঘর-সংসার করলে না কেন?"

"এই শোন কথা। ঘর-সংসার! ঘর-সংসার কি আর আমি দেখিনি। কত লোকের বাড়ী কাজ করেছি; কত জনের ঘর-সংসার দেখেছি। সেই সব দেখেই আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল,—রমেশ জানা আর ও-পথে গেলেন না, মাঠাকরুণ!"

বড় গিন্নী বলিলেন, "সে কি আর ভাল হয়েছে রমেশ!"

"ভাল, খুব ভাল হয়েছে মাঠাকরুণ! সংসারের কোন জালা ভুগতে হয় নাই। তা হলে কি এই রমেশ ছেলেকে পেতে মা! তা হলে দেখতে একটা পানী, জোজোর, চোর রমেশ। আমি বেশ আছি মা—কোন গোল নেই। এই আজ পঞ্চাশ বছর হোল—এই কান্দীর মত ধারগার ত কাটালাম; কিন্তু, কেউ বলতে পারে না যে, রমেশ জানা কোন দিন কোন অন্তায় কাজ করেছে। মদ-ভালের ত কথাই নেই, রমেশ তামাকটুকু পর্যন্ত কোন দিন খায় নাই। এই পান যে কি! কানিস তা তোমার ছেলে একদিনের গুরেও সুখে দিবে দেখে নাই। তার পর এই কান্দীও লোককে সুখিয়ে দেখো, তোমার এই ছেলের কোন বড় চাল কেউ কোন দিন দেখেছে কি না। কোন ষ্ট্রোল এই রমেশ জানায় নেই। তাই সে ছনিয়ার কাউকে ডরায় না। এত ধারগার কাজ করেছি; কেউ বলতে পারবে না যে, রমেশ কোন অবিশ্বাসের কাজ করেছে, কারও দিকে ক'ন করে চেয়েছে। এমন মায়ের পেটে রমেশ জন্মে নেই মা!"

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, “আজ্ঞা রমেশ দা, তুমি যে এই এতকাল চাকরী করেছ, মাইনে ত, পেয়েছ; সে সব টাকা কি করলে?”

“কি আবার করবা সব টাকা জমিয়ে রেখেছি। শুনবে দ্বিদি লক্ষ্মী, এখানে রামপ্রতাপ নেকামল বাবুর কুঠী আছে;—তারি বড় কুঠী। সেই কুঠীর বাবুরা আমাকে বড় ভালবাসে; কুঠীর বুড়া-কর্তা নেকামল বাবুর কাছে আমি অনেক দিন ছিলাম কি'না; বা মাইনে পেতাম, তা সব সেখানে জমা রাখতাম।”

“সেখান থেকে ছেড়ে এলে কেন?”

“সে কথা আর শুনো না; মনিবের কি নিন্দে করতে আছে? মনিব ভালই ছিল; বাড়ী বড় বড়া। যাক্ গে, সেখান থেকে ছেড়ে এলাম। কিন্তু টাকা আর তুলে আনলাম না। অত বড় কুঠী; টাকা কি আর মারা যায়। তার পর যখন বা রোজগার করেছি, সব ঐ কুঠীতে রেখে দিবেছি—এখনও রেখে দ্বিই।”

“আজ্ঞা, সেখানে কত টাকা হয়েছে রমেশ দা!”

“রমেশ দা তারই হিসেব করতে যার কি দা। ও-সব হিসেব টিসেব আমার নেই। বা পাই রেখে আসি;—ওরা ঠিকাবার লোক নয়। এই আর বছর ওদের বড় বাবু আমাকে ডেকে বললেন, ‘রমেশ, তোমার অনেক টাকা জমেছে; এ টাকা কি করবে?’ আমি বলিলাম আরও জমুক, শেষে একদিন তুলে

নিরে একটা ভাল কাজে লাগাব। বড় বাবু বললেন, টাকা  
 যে অনেক হয়েছে, সুধু আসল ত নয়, সুদও জমেছে।' শুনে  
 দিদি লক্ষ্মী, ওরা কেমন খাঁটি লোক—সুদ পর্যন্ত হিসেব করে  
 জমিয়ে রাখছে। সেই দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা বড়  
 বাবু, আপনারা যে টাকা-টাকা করেন, আমার এমন কি নয়শ  
 পঞ্চাশ টাকা জমেছে।' বড় বাবু বললেন, 'নয় শ পঞ্চাশ সে  
 বহুত জিয়াদা, দো হাজারকি উপরি হোগা!' আমি মনে  
 করলাম বড় বাবু ভাঙ্গা করছেন। তিনি আমার মনের কথা  
 বুঝে বললেন, 'মস্করা নেহি রমেশ, দো হাজারসে বাড়ি হোগা।'  
 হোগা ত হোগা! তার পর আর খোজ নিইনি। বুঝলে  
 দিদি লক্ষ্মী, আমার এত টাকা কি করে হোলো, তাই এক-এক  
 দিন ভাবি। চুরী ত করি নেই কোন দিন, কাউকে ঠকিয়ে  
 এক পরসোও কখন নিইনি।'

লক্ষ্মী বলিল, 'এতদিন থেকে কাজ করছ রমেশ না, তা  
 সুদে-আসলে দু হাজার টাকার উপর হবে তার আর আশ্চর্য  
 কি! আচ্ছা তোমার ত কেউ নেই, তুমি এ টাকা কি  
 করবে?'

রমেশ বলিল 'এই একটা কিছুতে দিবে বাব মনে করেছি।'

লক্ষ্মী বলিল 'রমেশ না, আমি বলি কি তুমি একটা বিয়ে  
 কর। চিরকালটা ত এই একভাবে কাটালে; এখন ঘর-  
 সংসার কর। শেষকালে দেখবার-শুনবার লোক হবে।'

রমেশ হাসিয়া বলিল 'বয়স হয়েছে কত জান দিদি লক্ষ্মী।





















